প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৫
প্রকাশক : বিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
গ্রন্থশ্রীর পক্ষে ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪৬/৫-বি, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

প্রচ্ছদ সজ্জা :
সমীরকুমার রায়চৌধুরী

মুদ্রক : বাসুদেব চন্দ্র
অর্চনা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩৭-এ, পার্বতী ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু' টাকা

প্রবীণ সাহিত্যিক

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সাহিত্যবিশারদ

জ্যেঠামহাশয়ের শ্রীচরণে

এই লেখকের লেখা :

নিশিগন্ধা

মাটির পৃথিবী

অন্নকূট

কলরোল

উপনদী

মেঘ-পাহাড়ের গান

এক

তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে কাঞ্চন—না, তপতী আসে নি। অথচ আজই তো আসার কথা এবং এই ট্রেনেই। মনের অস্থিরতা বেড়ে গেল কাঞ্চনের—তপতী কেন এলো না? সে কী তবে ভুল দেখেছে? তারিখটা ঠিক আছে তো?—না, এত গোলমেলে লোক কাঞ্চন নয়। কিছুতেই নয়। দু-এ শূন্য কুড়ি—আর আজই কুড়ি তারিখ; বিশে অক্টোবর। এতে আর কোন ভুল চুক নেই। তবু মনের দ্বিধা যায় না। বুক পকেটেই রয়েছে নীল রঙের খামখানি। তাতে তপতীর পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা। কাঞ্চনকে লেখা তপতীর চিঠি। সংক্ষিপ্ত কথা—তবু এ-কথার যেন শেষ নেই। কতবার যে কাঞ্চন পড়েছে তার আর ইয়ত্তা হয় না।

তবু আর একবার পড়ে—বিশ তারিখ না হয়ে যদি বাইশ তারিখ হয়; কিংবা পঁচিশ। তা হলে কাঞ্চনকে একেবারে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে না। আরো একদিন আকুল প্রত্যাশা নিয়ে আবার তাকে আসতে হবে। এই ট্রেনটির জন্যে অপেক্ষাও করতে হবে। রাত থাকতে উঠে রামবাহাদুরকে জাগাতে হবে। যা ঘুম রামবাহাদুরের! উঠতে কী চায়? রামবাহাদুরকে ছাড়াও অবশ্য কাঞ্চনের চলে।

আজকাল হাত তার পরিষ্কার। সুন্দর ড্রাইভ করে সে। তবুও পাহাড়ী রাস্তা; চড়াই আর উৎরাই। দু'পাশে বাঁধের বালাই নেই —নীচে খদ। একবার ষ্টিয়ারিং-এ হাত স্লিপ করলেই হয়, গভীর নীচে গাড়ি আরোহীসমেত কোথায় তলিয়ে যাবে যে তার আর ঠিক্-ঠিকানা থাকবে না। তাই এতটা দুঃসাহস কাঞ্চন এখনও করে না। আর যে রাস্তা কালিম্পং-এর! পাহাড়ী রাস্তায় পাহাড়ী ড্রাইভারই ভালো। যন্ত্র আর প্রকৃতি—উভয়ের সঙ্গে মিতালী এদের। ভারি সুন্দর ড্রাইভ করে রামবাহাদুর। নাঃ—তপতী তা হলে এলো না। যদি না আসাই সাব্যস্ত হল—তা হলে টেলিগ্রাম করে অন্ততঃ তার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাকে না জানালেও তার বৌদিকে জানালেই হত। এতখানি কষ্ট করে পেট্রোল পুড়িয়ে সে আর শিলিগুড়ি ষ্টেশনে হাজির হত না। আচ্ছা, পেট্রোল না হয় পুড়ল—তাতে আর এমন কী ক্ষতি? কিন্তু কত ভোরে উঠতে হয়েছে তাকে—আসাম লিঙ্ক ধরবার জন্যে। পাহাড়ের পথে তখন শুধু কুয়াশার জাল—সারা পথ হেড লাইট্ জ্বালিয়ে আসতে হয়েছে।

বৌদি অবশ্য বারণ করেছিলেন—এত কষ্ট করবার কী বা দরকার! স্টেশনে তো গাড়ির অভাব নেই! কিন্তু তাই কী হয়? একটা মর্যাদা আছে তো তপতীর!

তবু তপতী এলো না। দুর্ভাবনার কাঁটা যেন মনটায় খচ্ খচ্ করে কাঞ্চনের। পথে কোন বিপদ হলো না তো? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করে? কলকাতা থেকে আসাম লিঙ্ক বেশ স্বচ্ছন্দে এসেছে তো?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে কাঞ্চন। যাত্রীরা সব প্ল্যাটফরম

ছেড়ে চলে গেছে এতক্ষণে। যায়নি শুধু একজন। হাতের স্যুট্কেশের সঙ্গে যার ছোট্ট একটি বেডিং বাঁধা। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাট-ফরমে দাঁড়িয়ে যে ধূসর হিমালয়ের প্রতি আত্ম-নিমগ্ন হয়ে আছে।

শুনছেন?—কাঞ্চন ডাকলে।

সে-ডাকের কোন প্রত্যুত্তর নেই।

পাগল নাকি?—কাঞ্চন ভাবলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে। স্যুটকেশ আর বিছানা-পত্তর নিয়ে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে এমন হাঁ-করে দেখবারই কী আছে?—কষ্টও কী ছাই হচ্ছে না মাল-পত্তর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে? একটা কুলি পর্যন্ত ডাকে নি। আচ্ছা মেয়ে তো!

শুনছেন? কাঞ্চন আবার ডাকলে।

এবারে মেয়েটি ফিরে তাকালে। আমাকে বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী বলুন?

কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিগ্যেস করি।

কী বলুন না।

আপনি কী লিঙ্ক এক্সপ্রেসে আসছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কলকাতা থেকে?

হ্যাঁ।

ট্রেনটা বেশ নিরাপদে এসেছে? রাস্তায় কোন এক্সিডেন্ট হয় নি তো?

না, কেন বলুন তো?

কাঞ্চন বললে, আমার এক আত্মীয়ার আসার কথা ছিল কিনা; তাই।

ও, তা তিনি বুঝি আসেন নি? প্রশ্ন করল মেয়েটি।

না, তাই ভাবনা হচ্ছে।

হয়ত কোন কাজে আটকে পড়ে গেছেন তাই আসতে পারেন নি।

কাল চিঠি পেয়েছি তাঁর—এই ট্রেনে আসবেন জানিয়েছেন। হঠাৎ কী এমন কাজ এসে আটকে দেবে? তা নয়।

কাঞ্চনের কথায় স্মিত মুখে মেয়েটি বললে—কিংবা ট্রেন ফেলও তো করতে পারেন।

কাঞ্চনের মনে এতক্ষনে এই কথাটি ধরেছে—তা যা বলেছেন! তা হতে পারে। যা অলস মেয়ে সে। আটচল্লিশ ঘণ্টায় তার দিন হয়, এমনি স্পীড তার।

তবে তাই হবে।—মেয়েটি এ-প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে।

কাঞ্চন তবু নিরস্ত হয় না। মনের সংশয় এখনো যায় নি তার। বললে—তা হলে তো টেলিগ্রাম একটা নিশ্চয়ই করত। জানে বৌদি কত ভাববেন তার না-আসার জন্যে। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলেন।

কাঞ্চনের ছেলেমানুষী কথায় মেয়েটি হেসে উঠল।

আপনি হাসছেন?—জানেন না, আমার বৌদি কত নার্ভাস!

অনুমান করতে পারি! কিন্তু আরো বেশি জানলাম—আপনি তাঁর চেয়েও নার্ভাস।—ভাববেন না। বাড়ি ফিরে গিয়েই খবর পাবেন তাঁর। এতক্ষণে নিশ্চয়ই টেলিগ্রাম এসে গেছে।

মেয়েটির কথায় কাঞ্চন আশ্বস্ত হল।

আচ্ছা আসি তবে। নমস্কার—মেয়েটি মাথা নত করলে। ডান হাতে স্যুটকেশ আর বেডিং—বাম হাতে একটি গরম ওভারকোট

ঝোলান। দু'হাত যুক্ত করে বিদায়-অভিবাদন জানাবার তাই উপায় নেই।

এতক্ষনে কাঞ্চনের স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। নিজের ব্যবহারে সে লজ্জিত হয়ে উঠে। ছিঃ, ছিঃ, ভদ্রমহিলার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছে সে। মোটঘাট নিয়ে কত কষ্টই না পেয়েছেন।
কাঞ্চন কুণ্ঠার সঙ্গে বললে—ক্ষমা করবেন! দিন মাল-পত্তরগুলো আমার হাতে। স্টেশনে কুলি পাননি বুঝি?

মেয়েটি জানালে—ধন্যবাদ। সামান্য জিনিস, মোটেই ভারি নয়। আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। এর জন্যে আর কুলি ডাকবার প্রয়োজন বোধ করি নি।

তবুও। ভারি বিশ্রি লাগছে আমার। দিন আমার হাতে।

আমার জিনিস আপনি বইবেন কেন?

কাঞ্চন পাল্টা প্রশ্ন করলে—আমার কথার আপনি উত্তর দেবেন কেন?

মেয়েটি হেসে ফেললে—কঠিন প্রশ্ন করেছেন দেখছি। দাঁড়ান উত্তর দিচ্ছি—একটু ভাবতে হবে।

ভাবতে থাকুন ততক্ষণ। কাঞ্চন বেডিং বাঁধা স্যুটকেশটি ছিনিয়ে নিলে মেয়েটির হাত থেকে।

এ কি?

বেয়াদপি মাপ করবেন।—এটা অশিষ্ট আচরণ হলেও নিতান্তই ভদ্রতা। আপনি একজন ভদ্রমহিলা।

কাঞ্চনের কথায় মেয়েটির সঙ্কোচ কেটে গেল।

কোথায় যাবেন?

দার্জিলিঙে।

কোন্ আত্মীয়ের বাড়ি ?

না। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে।

একলা ?

দোকলা আর কোথায় পাব বলুন ?

তা হলে কোথায় উঠবেন ? লুইস্ স্যানাটোরিয়ামে ? না—অন্য কোন হোটেলে ?

যেখানে জায়গা পাব। কোথাও না পাই ধর্মশালায়।

মেয়েটির বেডিং বাঁধা স্যুটকেশটির ওজন কম নয়। একটুখানি চলতে না চলতেই কাঞ্চন তা অনুমান করল। অথচ এ-ক্ষেত্রে কুলি ডাকাও যায় না—পুরুষের পৌরুষে তা আঘাত লাগে। কাঞ্চনের বিস্ময় বোধ হয়—আচ্ছা মেয়ে তো! এই ভারি মোট নিয়ে অবলীলাক্রমে এতক্ষণ চলেছিল!

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেও প্রভুর দর্শন না পেয়ে রামবাহাদুর প্ল্যাটফরমের দিকেই এগিয়ে আসছিল। কাঞ্চন তাকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। ভারি বোঝাটা তার হাতে তুলে দিয়ে অতঃপর নিশ্চিন্ত হল সে। এইবারে তবু একটু সুস্থ মনে কথা বলা যাবে।

মেয়েটি অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, আপনার নাম কী কাঞ্চন রায় ?

বিস্ময়ের অবধি রইলো না কাঞ্চনের। বললে—হ্যাঁ। আপনি জানলেন কেমন করে ?

আপনার বাড়ি কী বালিগঞ্জে পাম এ্যাভেন্যু ?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল মেয়েটি।—তা হলে ঠিকই চিনেছি।

অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে পরিচিত বলে বোধ হচ্ছিল ; কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না যে কোথায় দেখেছি।

তা কোথায় দেখেছেন আমাকে ? কাঞ্চন প্রশ্ন করলে।

আপনি তো সুস্মিতার দাদা ?

হ্যাঁ। সুস্মিতা আমার কাজিন, মাসতুতো বোন।

দেখুন, তা হলে ঠিক চিনেছি।

হ্যাঁ, আপনার স্মরণশক্তির তারিফ করি। কিন্তু আমাকে আপনি বিপদে ফেললেন।

কিসের বিপদ ?

আপনাকে চিনতে না পারার বিপদ।

ও, এইমাত্র। তা নাই বা চিনলেন ?

কাঞ্চন সত্যিই লজ্জা পেয়ে গেল। যিনি তার সম্পর্কে এতখানি তথ্য আবিষ্কার করেছেন—নাম, ধাম, এমন কি গোত্র পর্যন্ত, তাঁকে সম্পূর্ণভাবে না-চিনে ছেড়ে দেওয়া চরম অভদ্রতা। বললে—কিছু মনে করবেন না। স্মরণ শক্তি সত্যিই আমার খারাপ; তাই বি-এস্-সিতে অনার্স পেলাম না।

মেয়েটি স্মিত মুখে বললে—এত ভালো স্মরণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমার পক্ষে আরো লজ্জার কথা যে বি-এ পাশ করেছি বটে। তবে অনেক কষ্টে—কোন রকমে পাশ-কোর্সে।

শিশুর মতন হাততালি দিয়ে উঠল কাঞ্চন—কী আশ্চার্য ! আমাদের দু'জনের মধ্যে কী চমৎকার মিল দেখুন তো। প্ল্যাটফরমের বাইরে এসে পড়েছি। আলাপটা আরো একটু জমুক না কেন ? চলুন, এক পেয়ালা কফি পান করা যাক্ ! সারা রাত ট্রেনে কাটিয়েছেন। নিশ্চয়ই ক্লান্তি বোধ করছেন ?

নিশ্চয়ই না। তবুও কফি খেতে আপত্তি নেই। ভীষণ আনন্দ পাচ্ছি। ভারি নতুন লাগছে আজকের দিনটিকে। এক সঙ্গে উচ্ছ্বাসের আধিক্যে অনেকগুলি কথা বলে ফেললে মেয়েটি।

কাঞ্চন রামবাহাদুরকে মাল-পত্তর গাড়িতে রেখে দিতে বলে অপেক্ষা করবার আদেশ দিলে। তারপর নব-সঙ্গিনীকে নিয়ে রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে গিয়ে ঢুকলে। ওয়েটারকে ডেকে কফির সঙ্গে কিছু টুকি-টাকি খাবারের অর্ডার দিয়ে সে মেয়েটিকে জিগ্যেস করলে—লজ্জার মাথা খেয়েই প্রশ্ন করছি। মনে কিছু করবেন না। আপনার নাম ?

রাগিনী চ্যাটার্জী।

কোথায় বাড়ি ?

আপততঃ কলকাতায়—পার্ক সার্কাস।

আদি বাড়ি ?

ঢাকা, বিক্রমপুর।

তাই এত বিক্রম আপনার !

কিসে বুঝলেন ?

যে ভারি মোট অনায়াসে নিয়ে আসছিলেন। আর—

আর কী ?

আর একলা যে-ভাবে শৈল-বিহারে বেরিয়েছেন !

এতে কী খুব বিক্রমের প্রয়োজন হয় ?

হয় না ?

ওয়েটার গরম কফি আর আহার্য রেখে গেল। ক্ষুধা রাগিনীর পেয়েছিল। সেই কোন্ সকালে বাড়ি থেকে দুটি ভাত খেয়ে বেরিয়েছে —তারপর সত্যিকারের খাওয়া আর হয় নি। ইচ্ছে করছিল গো-গ্রাসে খায় ; কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দিলে।

কাঞ্চন বললে—নিন্, আরম্ভ করুন ! আর আমার পক্ষে এই যথেষ্ট ; কিন্তু আপনার আরো কিছু খাওয়া দরকার। নিন্, মেনু—যা খুসি অর্ডার দিন।

রাগিনী বললে—এই যথেষ্ট !

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আহারের পালা চলল। নিবিষ্ট মনে দুজনে আহারে ব্যস্ত।

কফিটা ঢালতে যাচ্ছিল কাঞ্চন। রাগনী বাধা দিলে—এটা আমাদের কাজ। বিক্রমপুরের মেয়ের এ-বিক্রমও আছে।

দুজনেই এ-কথায় একসঙ্গে হেসে উঠল। পেয়ালায় উত্তপ্ত কফির লিকার ঢেলে তাতে দুধ মিশিয়ে চিনির চামচটাকে তুলে নিয়ে রাগিনী জিগ্যেস করলে—ক'চামচ ?

যে ক'চামচ ইচ্ছে।

অর্থাৎ ?

মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ, ইতরজন কিনা ; তাই মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসি।

রাগিণী হেসে বললে—চমৎকার কথা বলেন আপনি।

কাঞ্চন উত্তর দিলে—আপনার কম্প্লিমেন্টএ খুসি হলাম। আপনার ভাষার সঙ্গেও আপনার নামের কিন্তু সুন্দর মিল আছে।

ধন্যবাদ ! ফিরতি জবাব দিলে রাগিনী।

আচ্ছা, সুস্মিতাকে চিনলেন কেমন করে ?

কিছুদিন আমরা এক কলেজে পড়েছিলাম ; লেডী ব্র্যাবোর্ণে।

ও। আর আমাকে ?

একদিন সুস্মিতার সঙ্গে আপনাদের পাম-এ্যাভেন্যুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

ও, এইবার মনে পড়েছে বটে। ইয়েস্, উৎফুল্ল হয়ে উঠল কাঞ্চন। আমার নাম কাঞ্চন শুনে ঠাট্টা করেছিলেন সেদিন আপনি।

ঠাট্টা করি নি। বরঞ্চ প্রশংসা করেছিলাম। আর সে প্রশংসা আপনার যোগ্য পাওনা।

সুস্মিতা এখন কী করছে?

ঘর-সংসার। ছেলে-পিলের মা। রীতিমত গৃহিণী যাকে বলে।

বাই জোভ্! কোথায় বিয়ে হয়েছে? স্বামী তার কি করেন? ক'টি ছেলে-মেয়ে?

কাঞ্চন বাধা দিয়ে বলে, দাঁড়ান। খেই হারিয়ে যাবে। একটা একটা করে প্রশ্ন করুন। সুস্মিতার শ্বশুর বাড়ি কলকাতাতেই। নিউ আলিপুর। স্বামী গেজেটেড অফিসার। আর তিন বছরের বিবাহিত জীবনে সে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের মা।

শুনে সুখী হলাম।

আর আপনি?—জিজ্ঞাসু নয়নে কাঞ্চন প্রশ্ন করলে।

শুধু কেরানি। তবু ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই সিনিয়র গ্রেড পেয়েছি সরকারি হিসেব-নিকেশ দপ্তরে। আর সিঁথের দিকে লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই বুঝছেন যে সিঁদুর পরবার সৌভাগ্য থেকে এখনো বঞ্চিত আছি।—কিন্তু আপনার কথা কিছুই শুনলাম না এখনো। যাঁর জন্যে অধীর-অপেক্ষায় রত ছিলেন তিনি বুঝি?

আজ্ঞে না। তিনি হচ্ছেন আমার বৌদির কাজিন্। মামাতো বোন আর কি!

তা হলে, ভারি মিষ্টি সম্পর্ক!

না, যতখানি মিষ্টি মনে করছেন ঠিক ততখানি মিষ্টি তিনি নন। তবে অম্ল-মধুর বলতে পারেন। আজ তাঁরই আসবার কথা ছিল।

তাঁর বদলে কিন্তু আমি এলাম।

হ্যাঁ, নাকের বদলে নরুণ আর কি !

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হল। পাওনা চুকিয়ে দেবার সময় মানিব্যাগ খুলে রাগিনী বললে, আমি দিচ্ছি।

তার মানে ?

মানে কিছুই নয়। খিদেটা আমারই বেশি পেয়েছিল।

কাঞ্চন বললে, আমিই কফি পানে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। যাক্, কথা কাটাকাটিতে আর দরকার নেই। খাবারের বিল কাঞ্চনই দিয়ে দিলে।

চলুন এইবার।

রাগিনী জিগ্যেস করলে, কোথায় ?

কালিম্পং।

কালিম্পং কেন ? আমি তো যাব দার্জিলিঙ্।

হেসে কাঞ্চন বললে, ওই একই কথা। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন।

রাগিনী বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলে কাঞ্চনের দিকে তাকালে—তার মানে ?

সহজ সরল কণ্ঠে কাঞ্চন বললে, মানে আবার কি ? কালিম্পং বেড়িয়ে তারপর দার্জিলিঙ যাবেন। দেখবেন দার্জিলিঙ্ থেকে কালিম্পংই আপনার ভালো লাগবে বেশি।

কেন ?

কালিম্পংএর প্রকৃতি আরো খোবার। ক্লাইমেট আরো ভালো। শীত অনেক কম। আর অজস্র ফুল সেখানে। ফুলের দেশই বলতে পারেন। বন আলো করে কমলালেবু। দার্জিলিঙে কী আছে ?

কেন ? দেবগিরি হিমালয়।

কথায় কথায় তারা ষ্টেশনের বাইরে এসে পৌঁছাল। ঝক্ ঝকে

একখানি গাড়ি থেকে নেমে রামবাহাদুর সেলাম জানিয়ে দরজা খুলে দিল।

কাঞ্চন বললে, উঠুন।

খানিকটা থমকে দাঁড়ালে রাগিনী।—তা কী করে হয়?

স্মিত মুখে কাঞ্চন বললে, কেন কুণ্ঠা কিসের?

না কুণ্ঠা নেই। তবুও।

তবুও আবার কী? আপনার পক্ষে তো কোন অসুবিধে নেই। তার কারণ শাস্ত্রে বলেছে 'অজ্ঞাত কুলশীলস্য'······

সেইটেই তো প্রকাণ্ড বাধা। আমাকে না জেনে শুনেই!

বিলক্ষণ। শাস্ত্র বাক্য তো অলঙ্ঘন করি নি। আপনি তো আর অজ্ঞাত কুলশীল নন। আপনি আমার বোন সুস্মিতার বন্ধু।

কিন্তু আপনার বাড়ির সব? বিশেষ করে আপনার বৌদিই বা কী মনে করবেন?

কিচ্ছু না। বরঞ্চ অত্যন্ত খুসি হবেন তাঁর ননদের বন্ধুকে দেখে।

তবু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলে রাগিনী।

কাঞ্চন প্রশ্ন করলে, আমার তরফের ভাবনাটা আমিই করব। আপনার দিক থেকে যদি কোন আপত্তি না থাকে!

বিলক্ষণ! আপাত্ত? আপত্তি আবার কিসের?

সেই কথাই তো বলছিলাম। উঠুন, উঠুন, গাড়িতে উঠে না হয় আর যা সব ভেবে দেখবেন। কালিম্পং থেকে দার্জিলিঙ্ কাছেই।

গাড়িতে উঠে বসল রাগিনী। পিছনের আরামদায়ক সীট। কাঞ্চন সোফারের পাশে বসতে যাচ্ছিল। রাগিনী বাধা দিলে—ও কী, ওখানে বসছেন কেন?

ওটা লেডীস্ ওনলি!

উচ্চকিত হাসিতে ভুলে উঠল রাগিনী—কই, তা তো লেখা নেই এখানে কিছু।

সব লেখাই কী চোখে পড়া যায় ?

হেঁয়ালি থাক্। আসুন এখানে।

পারমিশন দিচ্ছেন তা হলে ?

পিছনের দিকে সীটে এসে বসল কাঞ্চন। গাড়ি ছেড়ে দিলে। পিচ ঢালা সোজা রাস্তা। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে খানিকটা যেতেই সেবকের পথে মোটর ছুটে চলল। হেমন্তের উদ্ভাসিত রৌদ্র। পথের দুধারে অরণ্য শোভা।

চুপ করে বসেছিল রাগিনী। ভাবছিল আকস্মিক এই ঘটনার কথা। ঘটনা থেকে দুর্ঘটনায় না পড়ে। না, সে আশঙ্কা নেই। কাঞ্চনকে তার চেনা হয়ে গেছে। তার সম্পর্কে কোন আশঙ্কার কারণ নেই। ভাবছিল কাঞ্চনের বাড়ির কথা। আর আর পরিবার পরিজনবর্গ—বিশেষ করে তার বৌদির কথা। কাঞ্চনের ব্যবহার অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ সন্দেহ নেই ; কিন্তু তবুও—তবুও কোথায় যেন একটা সঙ্কোচের আবরণ।

না:, সে-সঙ্কোচকে কাটিয়ে উঠবে রাগিনী। সেতো আর কচিখুকিটি নয়---আর অত অপরিনত মনও তার নয়। পুরুষ সম্পর্কে বিশেষ কোন দুর্বলতা তার নেই। শাস্ত্রে বলে—আগুন আর ঘি। এ, যুগে এ মত-বাদ অচল। কর্মময় জীবনে আজকে পুরুষ আর নারীতে প্রভেদ কিছু নেই। অসঙ্কোচে নিত্য নবীন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা এ কালে আর নিন্দনীয় নয়।পুরুষকে যেমন বনের বাঘের মতন ভয় করত নারী, আর নারীকে যেমন সোনার পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখা হত—এই কিছুদিন আগেও; আজকের দিনে তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। ট্রামে, বাসে,

পথে, ঘাটে, সিনেমায়,ট্রেনে এখন পুরুষ আর নারী পাশাপাশি চলেছে। সর্বক্ষেত্রেই অবাধ গতি। সঙ্গিনী তখনকার দিনে ছিল না—বান্ধবীও ছিল না—নারী ছিল শুধুমাত্র জীবন—সঙ্গিনী বা ভাত কাপড়ের দাসী। এখন কিন্তু নারীর সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা। নারী আর পুরুষ এক। সঙ্গিনী, বান্ধবী, সহ কর্মিনী—কতরকম সংজ্ঞাই না দেওয়া চলে। কাঞ্চনের ক্ষেত্রে ক'দিন সে না হয় সঙ্গিনী কিংবা বান্ধবীই হল তার। তাতে আর ক্ষতি কী? ক্ষতি কিছুই নেই, বরঞ্চ লাভ ষোলআনাই।

দুই

ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে রাগিনী। ঘটা করে প্রচার করেছে শৈল বিহারের কথা। সরকারী দপ্তরের সিনিয়র গ্রেড কেরানি, শুনতে ভালো বেশ! কিন্তু ক'টাকাই বা আর আয়? আশিতে ঢুকেছিল, এখন বেড়ে একশোর ওপরে কিছু উঠেছে। আর কত পোষ্যই না প্রতিপালন করতে হয় তাকে। বাপ-মা ভাই-বোন এক, কথায় জাজ্জ্বল্যমান সংসার। মাত্র তেইশ বছর বয়েসে সেই সবার অভিভাবিকা। বিক্রম-পুরের মেয়ে সে! কাঞ্চন ঠিকই বলেছে, বিক্রম তার আছে বৈকি! তার বাবা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। দেশ বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় সেখানকার তল্লাতল্লা উঠিয়ে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তবু যা হোক্ কিছু আয় ছিল তাঁর! আর সেই আয়েতেই এতদিন সংসার চলেছে। দুটি ছেলে, একটিও মানুষ নয়। বাজারের পয়সা মেরে বড়টি ফোর্থ ক্লাস সিনেমার টিকিট কিনত, বিড়ি ফুঁকত, আর লারে লাপ্পা গান গাইত। অনেক ধরা-ধরি করে রাগিনী তবু তাকে একটা ওয়ার্কশপে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, মাস গেলে সে এখন সত্তর-আশী টাকা আনে। কিন্তু হলে কী হয়, তার নিজের খরচই মাসে চল্লিশ টাকার কম নয়। ছোটটি পড়ছে, পড়ছে না ছাই! পড়ার নামে বকামি করছে। বোন দুটি ভালো। তাদের

প্রতিই রাগিনীর সতর্ক দৃষ্টি। তার ভবিষ্যৎ বলতেই তারাই যা-কিছু। বাপের আক্কেল বিবেচনা কিছুই নেই। বয়েস ষাটের কাছাকাছি; কিন্তু পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা আজো যায় নি। মা তার আবার অন্তঃসত্ত্বা। এই সংসারের ভারি জোয়াল তার কাঁধে। তেইশ বছরের মেয়ে এই বোঝা বহন করে চলেছে।

তবু ভাগ্যিস্ দূর সম্পর্কের এক মাসি ছিলেন। বাপের সংসার বিক্রমপুর থেকে তাকে কলকাতার পার্ক সার্কাসে নিজের কাছে এনে লেখা-পড়া তিনিই শিখিয়েছিলেন। তাই বি-এ পাশ করেছে রাগিনা। আর তোড়জোড় করে গভরমেণ্টের দপ্তরখানায় সিনিয়র গ্রেড কেরাণিগিরিও পেয়েছে নিতান্তই ভাগ্যের কৃপায়।

মোটরের স্পীড কমে গেল।

দেখুন, কী চমৎকার দৃশ্য সেবকের! এবারের বর্ষার জলের বেগ এখনো কমে নি।

কাঞ্চনের কথায় রাগিনীর চমক্ ভাঙে। সত্যিই সুন্দর দৃশ্য! সেবকের ব্রিজে উঠতে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে রাগিনী, তর তর করে নদীর জল বয়ে চলেছে। সামনে হিমালয় অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে।

এ পথে এই প্রথম আসছেন?

হ্যাঁ। কাঞ্চনের কথার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে রাগিনী আবার আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রইল।

মাসি আর নেই। তবু সৌভাগ্য যে তিনি তাকে মানুষ করে দিয়ে গেছেন। ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেবেন তিনি, এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেন না তিনি।

আরো দুর্ভাগ্য যে কোন ব্যবস্থাই তার জন্যে তিনি করে যেতে পারেন নি।

হঠাৎ মারা গেলেন তিনি। সুস্থ লোক। পাঁচ মিনিট আগেও হেসে গল্প করছিলেন। তারপর কী যেন হল। বুকে অসহ্য ব্যথা—দম আটকে আসে। কথাবার্তা বলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল এবং ডাক্তার আসার সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

মাথা নীচু করে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন, থম্বসিস্!

জীবন আর মৃত্যু। কুড়ি বছর বয়েসে রাগিনী চিনলে পৃথিবীকে। কী শক্ত মাটি এখানকার।

মাসির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হল তাকে চিরদিনের মতন। নিঃসন্তান মাসি, কিন্তু নিজের ভাইপোই বাড়ির মালিক। রাগিনীর এতদিনকার দাবি, নিছক শুধুই ফাঁকি! তবু কপাল ভালো ; তাই না সেই সময়ই এমন চাকরিটি জুটে গেল। তার মতন পাশ-কোর্সে বি-এ পাশ করা মেয়ে কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চাকরি পাওয়ার সঙ্গেই পার্ক-সার্কাসেই দু'খানি ঘর পেয়ে গেল ; আর পাকিস্থানের মায়া কাটিয়ে সমস্ত সংসারটি ঘাড়ে চেপে বসল তার।

কী ভাবছেন বলুন তো? কাঞ্চন প্রশ্ন করলে।

ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল রাগিনী। বললে, না, কিছুই নয়ত।

মাথা নেড়ে কাঞ্চন বলে, না ; ঠিক বললেন না। কিছু যেন চেপে যাচ্ছেন। আমার বাড়িতে আপনার এমন ভাবে যাওয়াতে হয়ত সঙ্কোচ বোধ করছেন। কিংবা ভয় পাচ্ছেন হয়ত।

সঙ্কোচ বোধ হয়ত করছিল রাগিনী। কিন্তু ভয়। ফুঃ, বিক্রমপুরের

মেয়ের করবে ভয়? এ আর এমন কী? কত ভীষণ ভয়কে জীবন-পথে অতিক্রম করে এসেছে সে। ভয় পাবার মেয়ে সে নয়। অন্ততঃ কাঞ্চনের মতন ছেলেকে দেখে।

বিক্রমপুরের মেয়েকে কী এই চিনলেন শেষ কালে?

রাগিনীর কথায় কাঞ্চন বললে, না। সত্যি আপনাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। আর তার জন্যেই নিজ-আবাসে আমন্ত্রণ জানাবার আনন্দকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছি। আমার বাড়িতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠার কোন কারণ নেই—এটা বেশ হলপ করেই বলতে পারি।

তা অস্বীকার করছে কে?

তবে অমন গম্ভীর হয়ে গেছেন কেন?

নিজেকে ঢেকে নেয় রাগিনী।—সমস্ত রাত জেগেছি তো! তাই একটু ক্লান্তি বোধ করছি।

রাগিনীর কথায় আশ্বস্ত হয় কাঞ্চন। আরো জোর দিয়ে বলে, সত্যিই, আপনার অসুবিধে হবে না কোন, দেখবেন। বৌদি ভারি খুসি হবেন আপনাকে দেখে। আপনি সুস্মিতার বন্ধু!

আপনার মতন আমি অত ফেনিয়ে ফেনিয়ে ভাবি নে। এ বিশ্বাস আমার নিশ্চয়ই আছে যে আপনার বৌদি একজন মহিলাকে অন্ততঃ বাড়ির বার করে দেবেন না। তাঁর ননদ সুস্মিতার বন্ধু না হলেও দু'চারদিনের অতিথির প্রতি বিমুখতা তাঁর নেই।

রাগিনীর কথা শুনে স্মিত মুখে কাঞ্চন বললে, আমার বৌদি সম্পর্কে এতখানি ধারণা আপনার? তাঁকে না দেখেই?

হ্যাঁ। শুধু আপনার বৌদি কেন? বাংলাদেশের সকল বৌদি সম্পর্কেই আমার ধারণা একই রকম।

কেন মহিলা বলে?

হ্যাঁ। মেয়েদের এটা মেয়ে-প্রীতি বলতে পারেন।

রাগিনীর কথায় কাঞ্চন হেসে বললে, আপনার বিচার-বুদ্ধির তারিফ করতে পারলাম না।

রাগিনী প্রশ্ন করলে, কেন?

সাংসারিক বুদ্ধি আপনার কম।

বলেন কী? জানেন, একটি পুরো সংসারের আমি সব কিছু।

তা সত্ত্বেও।

কারণ?

কারণ হচ্ছে, এটা সহজ বুদ্ধি, যে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। মেয়েরাই মেয়েদের সহ্য করতে পারে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কাঞ্চন চুপ করে গেল; রাগিনী। পাহাড় আর পাহাড়। ঝরণা আর ঝিল্লীর ডাক—সমস্ত পথকে একটা ঘুরের মাধুর্যে ভরিয়া রেখেছে।

তিন

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। রাগিনীর হয়েছে ঠিক তাই। জীবনের এত বড় রোমান্স আর রোমাঞ্চকেও সে প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারছে না। কী আশ্চার্য! হিমালয়কে বেষ্টন করে পাহাড়ী পথ। চড়াই আর উৎরাই। ঘুরে ঘুরে মোটর ছুটে চলেছে। গাড়ির গতি মন্থর। ঝির ঝির করে ঝরণা বয়ে চলেছে। পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়। চারিদিকে শুধু শিলাময় জগৎ।

স্তব্ধ-বিস্ময়ে খানিকক্ষণ শৈল-পরিক্রমায় আত্মমগ্ন হয়ে ওঠে রাগিনী। কিন্তু আবার সেই ভাবনা। সিনিয়র গ্রেড কেরানি-জীবনের ভাবনা। আফিস আর বাড়ি। ব্যস্ত জনপদ আর ক্লান্তিকর জীবন।

এই এক ঘেয়ে জীবনকে ভুলতে চায় রাগিনী। একটানা ক্লান্তি অবসাদ আর বিরক্তির খানিকটা ছেদ টানতে চায় সে। ইঁট, কাঠ, আর কংক্রিট—ভীড়, কোলাহল আর রুদ্ধশ্বাস—তেইশ বছরের জীবনকে তার দলে পিষে মারছে। বাঁচতে চায় সে। তাই বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহ বৈকি! দুশো টাকা খরচ করে হিমালয় দর্শন। ম্যালে ওভার কোট গায়ে ঘুরে বেড়ানো, ঘোড়ায় চেপে ফটো তোলা—টাইগার হিলে গিয়ে ঘটা করে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখা—একী কম



বিদ্রোহ ? কম বিলাস ? এই বিলাস গ্রহণ করতে কম বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয় নি তাকে। বাপের সঙ্গে—মায়ের সঙ্গে, কত কথা-কাটাকাটি—কত ঝগড়া-বিবাদ।

বাপ-মায়ের রাগ তাঁদের বঞ্চিত করে, ভাই-বোন সংসার পরিজনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে দুশো টাকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া চরম নীতিহীনতা। গরীবের সংসারে অত সখের বালাই কেন ? রাগিনীর পক্ষেও যুক্তি আছে। তিলে তিলে জীবনকে ক্ষয় করে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম লব্ধ মাস-মাইনের টাকাগুলি—তা সে তো সমস্তই সংসারের গর্ভে যাচ্ছে। তার আত্মকেন্দ্রিক মনে তার জন্যে কী কম অনুশোচনা ? নিজের জন্যে কতটুকু ব্যয় করে সে ? ভাল শাড়ী-গয়না কেনা, সিনেমা যাওয়া, রেষ্টুরেণ্টে খাওয়া, ট্যাক্সি চাপা—না, কিছুই বিলাস নেই তার। এমন কী তেইশ বছরের যৌবনকেও উপেক্ষা করে চলেছে সে। বিয়ের কথা ভাবতেই পারে না। বাড়ির কেউই সে-কথা ভাবে না। ভাবলে, সংসার চলবে কেমন করে ?—সে-ভাবনা শুধু রাগিনীর। সংসারের কল্যাণে তার ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুই বর্জন করতে হয়েছে। তবু মন পায় না বাপ মায়ের ; ভাইয়েদেরও। কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত রাগিনীর কেটেছে বেশ। মাসি বড় লোক ছিলেন না ; তবু নিত্য অভাবের জ্বালা ছিল না তাঁর সংসারে। ছেলে মেয়ে হয়নি তাঁর। রাগিনী কিন্তু তার জন্যে সবটুকু স্নেহ তাঁর পেয়েছিল। স্কুল থেকে কলেজে পড়া। বি-এ পাশ করায় মাসিমার কত আনন্দ ! পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে য়ুনিভারসিটিতে সে পড়বে। আর মাসি পাত্র নির্বাচনের জন্য এখানে ওখানে অনুসন্ধান করতে লাগলেন ; কিন্তু পোড়া কপাল রাগিনীর। সব ওলট-পালট হয়ে গেল। দু'বছর চাকরি জীবন। রাগিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

জীবনকে যেন তার পিষে মারা হচ্ছে। পার্ক সার্কাসের ছোট দু'খানি ঘর যেন চোরা কুঠরি। হাওয়া নেই আলো নেই। দমবন্ধ হয়ে আসে।

তবু জীবন চলেছিল। কিন্তু যৌবন শুকিয়ে আসে। ছোট্ট একখানি ঘরে বাবা মা—ছোট একটি ভাই। আর একখানি ঘরে বড় ভাই ; একপাশে তার কাঠ দিয়ে ঘিরে নেওয়া একফালি জায়গায় সে আর ছোট বোন। দম বন্ধ হয়ে আসে বদ্ধ-হাওয়ায়—ভাদ্রের অসহ্য গুমোটে। তারই মধ্যে দিন চলেছিল।

হঠাৎ শুনলে মায়ের শরীর খারাপ। গা ঘুলোচ্ছে, বমি হয় মাঝে মাঝে। তারপর যা—তা শুনে শিউরে ওঠে রাগিনী। শিউরে উঠলে কী হয়, এই নাকি জীবন ! তাদের মতন মধ্যবিত্ত মধ্যচিত্তের এই হচ্ছে জীবন সংজ্ঞা।

বিদ্রোহ জাগে রাগিনীর মনে। কেন তবে এই আত্ম প্রবঞ্চনা ? তার জীবনে কী কোন বিলাস থাকতে নেই ? একটু দম ফেলে নিঃশ্বাস নেওয়া, হালকা হাওয়ায় একটু গা মেলে দেওয়া—এও কী খুব স্বার্থ-পরতা ? হোক স্বার্থপরতা ! তবুও সে বাঁচতে চায়। তাই হঠাৎ শিশিরকে সে সেদিন বলেই দিলে—হ্যাঁ, তাকেই সে বিয়ে করবে। তবে একটু দেরি আছে। একবার বাইরে যাবে সে। বাইরে থেকে ঘুরে এসেই এ বিষয়ে পাকাপাকি ব্যবস্থা করবে।

বাঁচতে চায় বলেই হঠাৎ সে দুশো টাকা খরচ করার মতলবে বেরিয়ে পড়েছে। দার্জিলিঙে শৈল-বিহার। সেখানে সে নিরিবিলিতে জীবনের নতুন যাত্রা পথের জন্যে প্রস্তুত হবে। কিছু দিন ধরে শিশির ঘোরাঘুরি করছে। শিশির তাদের প্রতিবেশী। রাগিনীকে বিয়ে করবার প্রস্তাব জানিয়েছে সে। দার্জিলিং যাওয়ার কথায় বাবা রুখে

উঠলেন—পয়সা গুলো কী এতই সস্তা? দশদিন ছুটি নিয়ে দার্জিলিঙ বেড়ানো?

আমার নিজের রোজগারে বেড়াচ্ছি—এতে কারুর কিছুই বলবার নেই। বললেও তা মানব না—এতটা কঠিন কথা অবশ্যি রাগিনী বলতে পারে নি বাপের মুখের ওপর। তবু বলেছে, একটুকু দরকার। আমার নিজের জীবনের জন্যে শরীরের জন্যে একান্তই দরকার।

কেন শরীরের আবার কী হল?

কী হল সে-খবর রাখে কে?

মা ফোড়ন দিলেন, রোজগারে মেয়ে। ও এখন স্বাধীন। তোমার আমার তোয়াক্কা করে কী? নিজের রোজগারের পয়সায় যাচ্ছে। তুমি আমি বাধা দেবার কে?

হ্যাঁ। ঠিক তাই। মুখে বলেনি রাগিনী। মনে বলেছে। আর তাই স্যুটকেশ গুছিয়ে বিছানা বেঁধে পার্ক সার্কাস থেকে সোজা চলে এসেছে শিয়ালদহে। সেখান থেকে আসাম লিঙ্ক এক্সপ্রেস। আসার সময় শুধু ছোট বোন কামিনীর আবদার শুনে এসেছে—দিদি ভাই, আমার জন্যে আর কিছু নয়, দার্জিলিঙ থেকে একটা পাথরের নেকলেস এনো।

কী পাথর চাস?

কামিনী জানিয়েছে—ক্যাটস্ আই।

কাঞ্চনের ডাকে রাগিনীর তন্ময়তা ভেঙে যায়। সত্যি করে বলুন তো, কী ভাবছেন আপনি?

রাগিনী বলল, কই কিছু তো নয়।

প্রথমবারের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। রাত্রি জেগে আর ট্রেন

জাগিতে ক্লান্ত হয়ে হয়ত বুঝি একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে ; কিন্তু শেষে দেখলাম চোখ দুটো আপনার খোলাই রয়েছে।

মৃদু হেসে রাগিনী জিগ্যেস করলে, আর কী দেখলেন ?

কাঞ্চন বললে, বাইরের চোখ দুটি খোলা ; কিন্তু মনশ্চক্ষুর সন্ধান কিছু পেলাম না।

তা মনশ্চক্ষুর সন্ধানে এত ব্যস্তই বা কেন ?

বড্ড শক্ত প্রশ্ন করে ফেললেন কিন্তু।

রাগিনী প্রসঙ্গটিকে চাপা দেবার চেষ্টা করে—সত্যিই একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল।

কাঞ্চন জিগ্যেস করে, জেগে ঘুম ?

মানুষ চোখ খুলেও ঘুমোয়।—আপনি কী বিশ্বাস করেন না ?

করি।

তবে ?

এক্ষেত্রে নয়।

তার কারণ ?

তার কারণ হচ্ছে গাড়ির এই বদ্ধ পরিবেশের বাইরে একবার চোখ মেলে চান তো।

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রাগিনী, সত্যিই কী অপূর্ব দৃশ্য। লভ্‌লি !

কাঞ্চন বললে, পাহাড়ের এমন অরণ্য-প্রকৃতি ছেড়ে যাতে আত্ম-নিমগ্ন হয়েছিলেন—তা নিশ্চয়ই কোন গভীরতর। অবিশ্যি তা নিয়ে আমার মাথা-ঘামানো অন্যায়। আমি শুধু আপনাকে সচেতন করবার চেষ্টা করছি—প্রথম হিমালয় দর্শনের অনুভূতিকে গ্রহণ করবার জন্যে। এমন অপূর্ব বিস্ময়—যার জন্যে এতখানি পথ কষ্ট করে আর খরচ করে ছুটে এলেন, তা থেকে বঞ্চিত হওয়া ঠিক হবে না।

রাগিনী বললে, অনেক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে তার জন্যে। আপনি আমার সত্যিকারের বন্ধু।

কাঞ্চন স্মিত মুখে উত্তর দিলে, বন্ধু নই ; বন্ধুর দাদা। অতএব আপনারও—।

না। দাদা নয়। বন্ধুই। বন্ধুর সঙ্গে অসঙ্কোচে মেশা যায়।

দাদার সঙ্গে বুঝি নয় ?

না। সর্বক্ষেত্রে নয়।

তা হলে দাদা নই ?

না। অন্ততঃ এই হিমালয়ের অরণ্য সঙ্কুল পথ-পরিবেশে নয়।

কাঞ্চন খুসি মনে বললে, বাঁচলাম। বহু ধন্যবাদ আপনাকে। দাদা হওয়ার জ্বালা অনেক। আপনার বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্যকে আমি প্রশান্ত-মনে বরণ করে নিলাম।

রাগিনী উত্তর দিলে,আমিও খুসি হলাম।

তা হলে এইবার সত্যি করে বলুন, তো, কী ভাবছিলেন এতক্ষণ ?

বিশেষ কিছুই নয়।

তবু ?

তার জন্যে আপনারই বা এত আগ্রহ কেন ?

বন্ধু বলে। যদি কিছু আপনার ভাবনার লাঘব করতে পারি।

কাঞ্চনের আগ্রহান্বিত প্রশ্নের উত্তরে রাগিনী শুধুমাত্র বললে, ভাবছিলাম ? ভাবছিলাম সংসারের কথা।

রাগিনীর কথায় পরিহাসের সুরে কাঞ্চন বললে, হিমালয়ে আসে লোকে বৈরাগী মন নিয়ে।

রাগিনী জবাব দিলে, সে হচ্ছে সংসার বৈরাগীর দল। আমি রক্ত-মাংসের মানুষ। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

আরো একটু রসিকতা প্রকাশ করলে কাঞ্চন, সংসারের মধ্যে থেকে সংসারের ভাবনা তো রোজই ভেবে থাকেন। দেবগিরি হিমালয়ে এসে আবার সে-ভাবনার জের টানছেন কেন? তবে আর কী সাধনা করলেন? তার চেয়ে বরঞ্চ আকাশ দেখুন। হিমালয়ের উচ্চতাকে উপলব্ধি করুন!

রাগিনী একটু উষ্ণ সুরেই জবাব দিলে, হ্যাঁ, মাটির মানুষ কিনা; তাই মাটির কথাই ভাবি। আপনাদের ভাবনার সঙ্গে আমাদের ভাবনার এইখানে তফাৎ।

রাগিনীর কণ্ঠস্বরে আর কথার বিন্যাসে কাঞ্চন একটু অবাক্ হয়ে গেল। সহজ সরল ভাবেই সে রসিকতা প্রকাশ করেছিল, রাগিনী তা বুঝল না কেন? বললে—আপনি অন্য অর্থ করবেন না আমারকথার।

এর ভেতর আর নতুন কী অর্থ থাকতে পারে কাঞ্চনবাবু? হিমালয় আপনাদের কাছে অনেক উঁচু কল্পনার বস্তু। তাই এখানে এসে আপনারা শুধু ভাব-জগতকেই উপলব্ধি করে থাকেন। আপনাদের অনেক অর্থ, বিত্তও তাই। আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। আমরাতো উঁচু আকাশের মানুষ নই। তাই হিমালয়ের উচ্চতাকে দর্শন অনুভূতির মানসিকতায় উপলব্ধি করতে পারিনে। আমরা হচ্ছি নীচের ওই অধিত্যকা। দেখতে পাচ্ছেন না?—পাহাড়ের তলায় ওই যে গভীর অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ? আমরা হচ্ছি ওই। যত উপরেই উঠি না কেন, নীচের তলার দিকেই চোখ আমাদের ফিরে ফিরে তাকায়। কিছুই নয়—শুধু অবস্থা-ভেদে দৃষ্টি-ভঙ্গির তফাৎ মাত্র!

রাগিনীর কথায় কাঞ্চন ব্যথিত হল। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে—মাপ করবেন রাগিনীদেবী! সত্যিই আমি আপনাকে আঘাত করবার জন্যে কিছু বলিনি। আমার কথা নিতান্তই হাল্কা। নিছক

শুধু কথার কথা। আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

রাগিনী তার রূঢ়তায় লজ্জিত হয়ে উঠল। যে বন্ধু এতখানি উদার—সামান্য মাত্র কিছুক্ষণের আলাপে এত সৌজন্য প্রকাশ করেছে তার প্রতি এ-বিমুখতা সত্যিই অনুশোচনা জাগায়।

রাগিনীও ক্ষমা প্রার্থনা করবেন—হঠাৎ বড় রূঢ় হয়ে পড়েছিলাম কাঞ্চনবাবু। কিছু মনে করলেন না। নিজেকে সে আরো মেলে দিলে কাঞ্চনের কাছে। আরো কাছে সরে এসে বললে—সত্যিকারের বন্ধু বলেই গ্রহণ করেছি আপনাকে। সংসারে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে একটু আনন্দের সন্ধানে বেরিয়েছি। মাথার ঠিক ছিলনা—তাই হঠাৎ আপনাকে আক্রমণ করে বসলাম।

সহানুভূতিতে গলে পড়ল কাঞ্চন। কঠিন বরফ যেমন গলে পড়ে তেমনই। পাহাড়ে কঠিন বুক থেকেও নির্ঝরিণীর ধারা বয়ে চলে ঝির ঝির করে।

আশে পাশে ঝর ঝর শব্দ ধারা ঝরছিল। কাঞ্চন বললে—দেখুন কী সুন্দর এই ঝরণার ধারাগুলি!

রাগিনীর চোখ তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পাহাড়ের অরণ্যময় প্রকৃতি!

গাড়ি ঘুরে ঘুরে উঁচুতে উঠছে। একটু একটু করে অনেক উঁচুতে উঠেছে। নীচে গভীর খদ দেখলে ভয় করে। রাগিনী আর নীচের দিকে তাকায় না। শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে পাহাড়ের অরণ্য-পথের দৃশ্যাবলী।

হেমন্তের প্রসন্ন সকাল। সোনার রোদে চারিদিক ভরে গেছে।

সকাল পার হয়ে গিয়ে দুপুরের রোদ পাহাড়ের গায়ে ঝক ঝক করছে। আর নীচে পাহাড়ী নদী তিস্তা রূপালি রেখায় প্রবাহিত। ঝিঁ ঝিঁ করে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে—কী অপূর্ব সুর। সেতারের ঝালায় কখনো সীড়ের টান—কখনো বা বহু সুরের ঝঙ্কৃত সুরধ্বনি।

করোনেশন ব্রীজ পার হয়ে গেল। গাড়ি থামিয়ে রাগিনীকে কাঞ্চন দেখালে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অপূর্ব যন্ত্র-কৌশল। রাগিনী তা দেখলে বটে ; কিন্তু আরো বেশি করে দেখলে—তিস্তার স্রোতধারা। তর তর করে পাহাড়ী-কন্যা বয়ে চলেছে—ছোট ছোট ঢেউ এর তুফান তুলে ঘূর্ণীর আবর্ত আর সাদা সাদা ফেনা। নদীর কলতানও অনেকক্ষণ ধরে শুনতে লাগল।

কাঞ্চন বললে—আপনার সত্যিকারের শিল্পি-মন।

রাগিনী প্রশ্ন করলে—কেন ?

করোনেশন ব্রীজ ছেড়ে তা না হলে তিস্তায় কেউ মেতে ওঠে ? কাঞ্চনের কথায় রাগিনী হাসলে—এ-যুগে এটা কিন্তু অপবাদ।

কেন ?

এমন উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে এখনো কেউ যদি অরণ্য-প্রকৃতি নিয়ে মেতে থাকে—তা হলে তার রুচিকে কিছুতেই প্রশংসা করা যায় না।

কাঞ্চন প্রশ্ন করল—বিজ্ঞানকে আপনি ভালো বাসেন না ?

রাগিনী বললে—নিশ্চয়ই বাসি। তবুও কেমন যেন দুর্বলতা—প্রকৃতি আজো টেনে নিয়ে যায় বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে।

ওটা একটা সংস্কার। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন—'দাও ফিরে সে অরণ্য!'

হয়ত তাই।

আচ্ছা বলুন তো সত্যি করে এমন আলো জ্বালা নগর

ছেড়ে আমরা কী আর এ-যুগে আবার আদিম আরণ্যক হতে পারি ?

হলে তবে বুঝতাম ! না হয়ে কী করে মন্তব্য প্রকাশ করি বলুন ?

রাগিনীর এ-কথাতে কাঞ্চন খুব খুসি হতে পারল না। সে নিজে একজন ইঞ্জিনিয়ার। পাথর কেটে নগর-গড়া তার কাজ। অরণ্য থেকে ইঁট, কাট, লোহার কংক্রীট-এর প্রতি অনুরাগ তার বেশি। কালিম্পং-এর পাহাড় কেটে নগর গড়ার কাজে সে আত্ম-নিয়োগ করেছে এবং গভরমেণ্ট কনট্রাকট সে পাচ্ছে। বেশ ছ'পয়সা রোজগার করে সে এ-ব্যবসায়ে। আর নিজের শিক্ষা-দীক্ষার ধারাতেও বৈজ্ঞানিক মন তার। তাই রাগিনীকে সে করনেশন ব্রীজ-এর কনস্ট্রাক্সনের কৌশল রীতি বুঝিয়ে বলছিল—কেমন করে নদীর ওপর ব্রীজটা ঝুলে রয়েছে ; আর নিরাপত্তা ও কত !

রাগিনীর আগ্রহ কম। এই পাহাড়-নদী আর মেঘ—এই তাকে আকর্ষণ করছে বেশি। খানিকক্ষণ থেকে তাই সে তাগিদ দিলে—চলুন এবার গাড়িতে ওঠা যাক !

করনেশন ব্রীজ পার হয়ে গাড়ির গতিপথে আরো কত দৃশ্য। পাহাড় আর পাহাড়, অরণ্য আব ধূসরতা। ঝর্ণা আর পাখীর ডাক। ফুল আর রঙ্। এরই মাঝে তিস্তা-ব্রীজ পার হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ধ্বস্ নেমেছে। পাহাড়ের খণ্ড অংশ ধ্বসে ধ্বসে পড়েছে। পাহাড়ী ছেলে-মেয়ে, যুবা-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কী কর্ম্মঠ তারা ! রাগিনী বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে।

ছুর্বোধ্য ভাষায় কাঞ্চন কয়েকজন পাহাড়ীর সঙ্গে কী যেন বললে।

রাগিনী জিগ্যেস করলে, কতদিন আছেন এখানে ?

এই বছর পাঁচেক।

এরই মধ্যে ওদের ভাষা এত রপ্ত করে ফেলেছেন ?

শুধু ভাষা কেন আচার-ব্যবহারও। আমি যখন পাহাড়ীর সাজে মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে কাজে বার হই—তখন আপনি আমাকে দেখলেও ভুল করবেন পাহাড়ী বলে।

দেখাবেন একবার আপনার সে বেশ !

আচ্ছা দেখাব।

রাগিনী আবার তন্ময় হয়ে গেল পাহাড়ী-দৃশ্যে। যে-রাস্তাটা এ-পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, আঁকা বাঁকা, সেই রাস্তায় পৌঁছে আবার দেখা যায় ফেলে-আসা পথের দৃশ্য। পাহাড়ের গা বেয়ে, পাইনের বনাচ্ছাদিত পথ। বাঁকের মুখ আসতেই সোফার রামবাহাদুর হর্ণ দেয়; কিন্তু সামনে—একেবারে অতিকাছে এসে পড়ে আর একখানি গাড়ি—কখনো জিপ, কখনো মোটর, কখনো ষ্টেশন ওয়াগন, কখনো বাস, কখনো লরি আবার কখনো বা পিক-আপ।

এই, এই রোখ্‌কে ! ভয়ে চীৎকার করে ওঠে রাগিনী।

ভয় নেই মাইজী ! একদম ব্রেক কষে ড্রাইভার রামবাহাদুর পরিষ্কার বাংলায় বলে। সামনের গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে রাম বাহাদুরের নমস্কার প্রতি-নমস্কারের পালা চলে। কাঞ্চন হেসে ওঠে। আর রাগিনী ভয়ে মাঝে মাঝে কাঞ্চনের আরো কাছে সরে আসে—একেবারে কাছ ঘেঁসে। বলে—ভয় করে না ?

মোটেই নয়। এইত মজা।

ছাই মজা !

কী রোমান্স বলুন তো ?

রাগিনী বলে—এ্যাডভেঞ্চার ; কিন্তু ভয় করে যে !

গাড়ি চলেছে। মাঝে মাঝে স্পীড দেয় রামবাহাদুর। বাঁকের মাঝে গতি হয় মন্থর। ঘোরা পথে মাথা যেন ঘুরে ওঠে। ভয় আর রোমাঞ্চের মাঝে সত্যিই এক অপূর্ব রোমান্স। রক্তের স্বাদ পেয়েছে রাগিনী। স্নায়ু-তন্ত্রীতে তার অপূর্ব পুলক-শিহরণ। ধমনীতে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ। জীবনের এক নতুন আস্বাদ। সম্পূর্ণ নতুনতর। নগরীর পীচ ঢালা রাস্তার দশ-পাঁচটার কেরানি সে আর নয়। নয় সে জন প্রবাহের শ্লথতম শিথিল ধারা। অবসাদে ভরা শরীর—ক্লান্ত চরণযুগল আর নেই। গলদ ঘর্ম হয়ে কোন রকমে ট্রামে কিংবা বাসে চড়ার দুর্ভোগও নেই তার সঙ্গে আর। পার্ক সার্কাসের অন্ধকার একতলার ছোট খুপরী,—নিঃশ্বাস যেখানে রুদ্ধ হয়ে আসে—সেখান থেকে সে মুক্তি পেয়েছে আজ। মহা-মুক্তি। প্রাণ ভরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে রাগিনী।

রোগা লম্বাটে চেহারা। তেইশ বছরের নারী-জীবনে যৌবনকে কোন রকমে ধরে রাখার প্রয়াস; কিন্তু বার বার তা ধূসরতায়, রুক্ষতায় ধরা পড়ে যায়। সামান্য পরিচ্ছন্ন একটু বেশ-ভূষা। কম দামের টয়লেটিং। সস্তা এসেন্সের গন্ধ; কিন্তু তাই—তাই যেন ভালো লাগছে। যে নারীত্বের আবেদনে সাড়া দিতে আসে আপিসের প্রৌঢ় রেকর্ড-কীপার কিংবা রুগ্ন ছোকরা কেরানি, কিংবা বখাটে পাড়ার বেকার, বা ট্রাম-বাসের ক্লিষ্ট সহ-যাত্রী—সে-নারীত্ব আজ মহা গৌরবান্বিত।

নীচের খদ থেকে ক্রমে ক্রমে—অনেক উঁচুতে উঠতে থাকে রাগিনী। সে যেন হিমালয় অভিযানে বেরিয়েছে। যাত্রা তার সার্থক। তা না হলে কাঞ্চনের হাত খানি তার করতল স্পর্শ করবে কেন?

কাঠের ঘর-বাড়িতে ইতঃস্তত ছড়ানো পাহাড়ী গ্রাম মাঝে মাঝে

দেখা যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ পথ অতিক্রম করে বন্য-পাহাড়ী প্রকৃতির মাঝে মানুষ জন। একটানা উঁচু-নীচু পথে থেকে থেকে ছেদ যেন। এমনি করে আরো পথ পেরিয়ে কাঠের ঘর-বাড়ির মাঝে ইঁট-কাঠ আর কংক্রীটেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ঠাণ্ডার একটা আমেজ লাগছে গায়ে। এইবারে ওভার কোটটা পুরোপুরি না পরিধান করলেও গায়ে ঢেলে নিতে যেন আরামই লাগে।

আপনার শীত করছে না? জিগ্যেস করলে রাগিনী কাঞ্চনের গায়ে একটি পপ্‌লিনের সার্ট দেখে।

হেসে কাঞ্চন বললে—না।

আমার কিন্তু করছে।

ওভার কোটটা গায়ে ঢেকে নিন না!

আপনি শুধু সার্ট গায়ে আর ট্রাউজার পরে আছেন কী করে?

শীত কোথায়? শীত তো নেই। শীত পড়ে নভেম্বর, ডিসেম্বরে। তাও এমন কিছু নয়।

বলেন কী? তা হলে বলব পয়সার গরমের জোরেই শীত আপনার কম?

পয়সা কি আমার খুব বেশি আছে?

নেই?

না, আছে। আমাকে বড়লোক ভাবলে আমি খুসিই হই। সে যাক! শীত আমার কম, তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেহে মেদ আছে। আপনি বড্ড রোগা কিনা, তাই শীত আপনার বেশি।

শরীর-তত্ত্ব আর অর্থ-তত্ত্ব থাক্—কোথায় এলাম বলুন তো?

প্লেন থেকে অনেক উঁচুতে। এই চার হাজার ফিট।

আর কদ্দর যেতে হবে?

এই তো এসে গেছেন। আমরা কালিম্পং প্রায় পৌঁছে গেছি।

পৌঁছে গেছি!—আনন্দে করতালি দিয়ে ওঠে রাগিনী।

কাঞ্চন বলে, নীচের দিকে এইবার তাকিয়ে দেখুন—তিস্তাকে কেমন দেখায়!

চমৎকার! একটা রূপোর ক্ষীণ স্রোত যেন ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাগিনী বলে—আর কি সুন্দর রঙ্ দেখুন! —সামনে সাদা। পেঁজা একরাশ তুলোর মতন। ওটা কী?

ওটা ফগ্।

পিছনে দেখুন, কী নীলের বাহার! নীল-সুনীল। না, নীলকান্তি। নীলান্ত।

ওটা মেঘ।

আর পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রাকৃতি ওই যে ঝকমকে ঔজ্জ্বল্য?

ওটা রোদ্দুর।

কিন্তু কাঞ্চন কই?

হেসে কাঞ্চন উত্তর দেয়—এই তো পাশেই।

অপ্রতিভ হয়ে ওঠে রাগিনী—এ কাঞ্চন নয়। আসল কাঞ্চন।

আমি কী তা হলে নকল?

আমি কী তাই বলেছি? নাঃ, আপনার সঙ্গে কথায় পারবার উপায় নেই। আমি জিগ্যেস করছি—কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা।

রাগিনীর কথায় কাঞ্চন বলে—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আজ আর দেখতে পাবেন না। সব-সময়ে তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। কাল তাঁর উদয় দেখবেন। আমার কাঁচের ঘর থেকে।

আর সূর্যোদয়? রাগিনী জিগ্যেস করলে।

কাঞ্চন বললে, সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখবেন দার্জিলিং-এ গিয়ে। টাইগার হিল্ থেকে।

রাগিনী প্রশ্ন করলে, কালিম্পং থেকে দেখা যায় না?

কাঞ্চন উত্তর দিলে, যায়। তবে ঘটা করে নয়।

ঘটা করে সূর্যোদয় দেখা আবার কী?

যা নিয়ে অনেক কাব্য করা যায়। সনেট লেখা যায়—লিরিকও লিখতে পারেন। আর যদি ফটো তুলতে পারেন তা হলে ভ্রমণ-কাহিনী লিখে মাসিক পত্রিকা থেকে দু'পয়সা রোজগারও করতে পারেন চাই-কি।

বলেন কী? আপনার আবার ও-বাতিকও আছে নাকি?

আরে রামো, ছোঃ। ও কাজ ভদ্রলোকে করে?

কারণ?

নিজের আনন্দকে ব্যবসার খাতিরে ফলাও করে প্রচার করা আর কী। তাতে জাতও যায় আর পেটও ভরে না।

কেন?

যে পয়সা খরচ করে আসেন, ছবি তোলেন আর তা লিখে পরিশ্রান্ত হন—তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক কী মেলে?

সাহিত্যকে আপনি এই চোখে দেখেন?

কাঞ্চন বলে—না, সবক্ষেত্রে নয়। সাধারণের ক্ষেত্রে।

গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। কাঞ্চনের কথার প্রতিবাদ আর করা হল না রাগিনীর। নভেলটি সিনেমার কাছে 'হিল-ভিউ'। কেয়ারী করা ফুলের বাগান। মাঝখান দিয়ে কাঁকর বিছানো পথ। কাঞ্চনদের বাড়ি। গেটে এ্যাল্‌সেসিয়ন বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠল—ঘেউ, ঘেউ।

মোটরের হর্ণের শব্দে উর্দিপরা চাকর ছুটে এল—পিছনে এলেন হাসতে হাসতে কাঞ্চনের বৌদি।

কেমন জব্দ ঠাকুরপো? বললাম—যেও না। গুরুজনের নিষেধ বাক্য তো শুনলে না! এখন শুধু পথের কষ্টই সার। বললেন কাঞ্চনের বৌদি।

রাগিনী বসে ছিল। এতক্ষণের পথের উত্তেজনা এখন আর নেই। বরঞ্চ কেমন যেন একটা সঙ্কোচ এবং ভয় এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললে। কাঞ্চন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, তা সে পূর্বেই অনুমান করে নিয়েছে। শুধু অনুমান কেন, তাদের বালিগঞ্জের পাম এ্যাভেন্যুএর বাড়িতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছে; কিন্তু এখানে যেন স্বতন্ত্র ব্যাপার। ফুলের কেয়ারী করা বাড়ি, সামনে গেট—নাম যার 'হিল-ভিউ'—সেখানে তার মতন সাধারণ দরিদ্রজনের এমনি সাজ-পোশাকে যেতেও যেন কুণ্ঠা জাগে। কী অপূর্ব সুন্দরী কাঞ্চনের বৌদি। তাঁর পাশে তার নিজের রূপ অত্যন্ত লজ্জা দেয় তাকে। ঠিক হয়নি তার এখানে আসা। এ-সমাজে সত্যিই সে বেমানান।

রাগিনীর দিকে এতক্ষণে লক্ষ্য পড়ল বৌদির।—কী আশ্চর্য কাকে নিয়ে এসেছ কাঞ্চন, এতক্ষণ কিছু বলো নি?

কাঞ্চন হেসে বললে? নাকের বদলে নরুণ। অর্থাৎ তোমার বোনের বদলে সুস্মির বন্ধু।

বৌদি অভ্যর্থনা জানালেন—এসো ভাই। সুস্মির বন্ধু, তাই আপনি আর বললাম না।

রাগিনী পুলকিত হল। কাঞ্চনের কথাই ঠিক। সে যে বলেছিল—দেখবেন আমার বৌদি কত ভালো—তা একটুও অতিরঞ্জন নয়।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে রাগিনী বললে—সে কি! আপনি

আমাকে আপনি বলবেন কেন? আমি আপনার চেয়ে সব দিক থেকে ছোট।

কাঞ্চন বললে, শিলিগুড়িতে গিয়ে তোমার বোনকে পেলাম না।

বৌদি বললেন, ওমা! তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। তপতী ট্রেন মিস্ করে টেলিগ্রাম করেছে—কাল বৃহস্পতিবার, কালকে বাদে পরশু দিন সে যাত্রা করছে। শনিবার এসে পৌঁছাবে। আর তোমাকে জানাতে বলেছে, এসেই সে এখান থেকে শিলঙ্ যাবে। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

তাই নাকি? এদিকে আমি দুর্ভাবনায় মরি। এই ভদ্রমহিলা সাহস দিলেন তাই! ইনিও কিন্তু বলেছিলেন যে তপতী ঠিক ট্রেন মিস্ করেছে।

কাঞ্চনের কথায় বৌদি হাসলেন, ফরসা ধবধবে মুখখানিতে ঈষৎ গোলাপী আভা। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল কাঞ্চনের বৌদিকে।

মাল-পত্তর নামানো হল। সেই স্যুটকেশের সঙ্গে বিছানার বাণ্ডিল। তাও একটা সতরঞ্চি মোড়া। কী বিশ্রিই যে দেখাচ্ছে! —রাগিনীর তা দেখে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল।

পুনরায় কাঞ্চন বললে, স্টেশনে এঁর সঙ্গে আলাপ। পরিচয়ে জানলাম সুস্মিতার বন্ধু, লেডী ব্র্যাবোর্ণে এঁরা এক সঙ্গে পড়তেন।

ও, তাই নাকি। তা বেশ, বেশ!

কাঞ্চন আবার বললে, যাচ্ছিলেন দার্জিলিঙে। আমি জোর করে টেনে আনলাম।

বেশ তো! দু'দিন এখানে থেকে দার্জিলিঙে গেলেই হবে।

কথা হচ্ছিল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। মাল-পত্তর বাড়ির ভেতর চলে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল রাগিনী। কুণ্ঠার ভাব তার

কিছুতেই যেন কাটছে না। সারা পথের মুখরতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কাঞ্চন বললে, চলুন!

বৌদি পুনরায় আহ্বান জানালেন, এসো ভাই ; এসো।

কাঁকর বিছানো পথে তিনজনেই চলতে লাগল। দু'পাশের বাগানে কত রঙ-বেরঙের ফুল। একটা ইউক্যালিপ্‌টস গাছের পাতা বাতাসে মৃদু মৃদু নড়ছে। বৌদি আর কাঞ্চন বেশ মিশে গেছেন।

রাগিনীর হল কী? পা যেন আর নড়তেই চায় না তার।

চার

বিছানাটা আশ্চর্য নরম।

দু'দিনের পথ-ক্লান্তির পর খাওয়া-দাওয়া সেরে একান্ত নির্জন ঘরে এমনি আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে রাগিনী খুবই পরিতৃপ্ত হয়। সতরঞ্চি মোড়া বিছানা পাতার আর প্রয়োজন হয় নি। সেটি স্যুটকেশের পাশে খাটের নীচে একান্তে পড়ে আছে।

ভারি ভালো লাগছে রাগিনীর। বৌদি খুব সুন্দর লোক। যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। খুব যত্ন করে খাইয়েছেন তিনি রাগিনীকে। এরই মধ্যে ঘর-সংসারের সব কথাবার্তা হয়ে গেছে। তিনি এ-বাড়ির আসল গৃহিণী। শাশুড়ি অবশ্যি আছেন—তবে তিনি নিজের নন। শ্বশুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তাঁরই বোনের মেয়ে সুস্মিতা। কলকাতায় এখনো মস্ত কারবার। হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট। ইদানিং ব্যবসা আর তেমন জমছে না। শ্বশুরের এ-পক্ষের দুই ছেলে সেই ব্যবসা দেখেন।

রাগিনী অবিশ্যি তাঁদের দেখে নি। একদিন মাত্র কলেজ-ফেরতা সুস্মিতার সঙ্গে গিয়েছিল। সে শুধু কাঞ্চনকেই দেখেছিল। আর সুস্মিতার মাসিকেও।

কাঞ্চনের দাদা অনেক দিন থেকেই কালিম্পং-এ। এখানে তিনি

একজন নামকরা কনট্রাক্টর। শুধু এই পার্বত্য অঞ্চলেই তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়—উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জায়গা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুর ডুয়ার্স—তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর। এখানে তিনি সখ করে বাড়ি করেছেন—জলপাইগুড়িতেও বাড়ি আছে। বছরে দুবার করে ওঠা-নামা করেন। দুটি ছেলে—একটি মেয়ে। কনভেণ্টে পড়ে। রাগিনী পাম-এ্যাভিন্যুতে তাই এদের সাক্ষাৎ পায়নি। এঁরা তখন জলপাইগুড়িতে।

কাঞ্চন বি-এস-সি পাশ করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কিছুদিন বাপের ব্যবসা দেখছিল। সেই সময় রাগিনী গিয়েছিল তাদের বাড়ি। দাদার প্রথম থেকেই আপত্তি কাঞ্চনের বাপের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করায়। বাপ বেঁচে থাকতে কিছু করে উঠতে পারেনি। বাপের মৃত্যুর পর তিনি তাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন এবং কনট্র্যাক্টরি ব্যবসায় জুড়ে দিলেন। দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠছে কাঞ্চন। এখন সে নিজের রোজগারে বেশ আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। এইবারে ইচ্ছে ভাইয়ের বিয়ে দেন। পাত্রীও নির্বাচন করা হয়ে গেছে। বৌদির কাজিন তপতী বেশ পছন্দসই মেয়ে। অবিশ্যি লেখা-পড়ায় বেশ চৌখস নয়। কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করেছে—কলেজেও গিয়েছিল; কিন্তু ওদের বাপের বাড়িতে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার রেওয়াজ আজো হয় নি। মোটা মোটা বই এর পেষণে শরীর এবং মনকে পিষ্ট করা। কেন বাপু, মেয়ে তো আর চাকরি করতে যাবে না কোন দিনই। তবে?

আর তপতীরও আগ্রহ নেই। তার চেয়ে নাটক-নভেল নিয়ে দিন কাটানো অনেক ভালো। লজিকের ডিডাক্টিভ্ আর ইনডাক্টিভ তত্ত্ব কিছুতেই তার মাথায় আসে না। কিংবা কমার্সিয়াল জিয়ো-

গ্রাফির কাষ্ট আয়রন—অতি নীরস বস্তু। তার চেয়ে তার বরঞ্চ গান-বাজনায় বেশ ঝোঁক আছে। সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত গায় আর সেতারও বাজায় ভালো। রেডিওতে প্রায়ই তার সেতারের প্রোগ্রাম থাকে। বাপের একমাত্র মেয়ে তপতী। শুধু কলকাতাতেই খান তিনেক বাড়ি। আর তাছাড়া পুরী, দেওঘর—এখানে-সেখানে বাড়ি আছে; জমি-জায়গা আছে। বিয়ে হলে কাঞ্চনই সব পাবে।

বৌদির কাছে এই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যে সকল কথাই শুনেছে রাগিনী। কাঞ্চনের সার্থকময় জীবনের সার্থকতম প্রত্যাশা। এমন মেয়ের জন্যে কার না আর লোভ হয়? সাধ করে কী কাঞ্চন অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তপতীর জন্যে শিলিগুড়ি ষ্টেশনে? ব্যস্ত হবারই কথা।

কিন্তু তার প্রতিও কাঞ্চনের সৌজন্য বোধ কম নয়। বাড়ির মধ্যে কোন ঘরখানিতে থাকলে তার অসুবিধে হবে না তার জন্যেও কম চিন্তা নয় তার।

বৌদি বললেন, সরকার মশাইয়ের ঘরের পাশের ঘরটা মন্দ কী? বেশ তো ছোটখাটো ঘর। দিব্যি আরামে থাকা যায়। জানলা দিয়ে পাহাড় দেখ—যত খুসি। পাহাড় দেখতেই তো এসেছে।

রাগিনী পরম আপ্যায়িত হয়। বলে—বেশ তো।

কাঞ্চন বলে—না। ওটা যেন বাইরের ঘরের সামিল। আর ওখান থেকে তিস্তা দেখা যায় না। তার চেয়ে ভেতরের ওই পশ্চিম কোণের ঘরখানা ঠিক করে দাও। তিস্তার প্রতিই ওঁর লোভ বেশি।

বৌদি অবাক হন।—তিস্তাকে আবার দেখবার কী আছে?

হয়ত কিছু আছে। সারা রাস্তা উনি তিস্তা দেখতে দেখতে এসেছেন।

কাঞ্চনের কথায় বৌদি হাসেন।

ভারি অপ্রস্তুত করে তোলেন আপনি মানুষকে। সারা রাস্তা শুধু তিস্তাই দেখেছি ?—ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে রাগিনী বলে।

হ্যাঁ। আপনি তো শুধু নীচের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। করোনেশন ব্রীজে উঠেও তিস্তাতে মেতে ছিলেন।

আরো রেগে যায় রাগিনী। —আপনি হয়ত জানেন না, আমাদের দেশে শুধু নদী আর নদী। পদ্মার পাশে তিস্তা ? নদী দেখে দেখে চোখ পচে গেছে।

বলেন কী ?

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি। আমি কিন্তু বৌদি আপনার নির্বাচিত ঘরেই থাকব। আপনি আপনার দেওরের কথায় কান দেবেন না।

কাঞ্চন বলে, না। ও ঘরের চেয়ে এ-ঘর ঢের ভালো। এই ঘরেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করতে চললাম। মুখে আপত্তি প্রকাশ করলেও রাগিনী এতে খুসিই হয় বেশি।

সেই ঘরেই শুয়েছে রাগিনী। কাঞ্চনের নির্বাচিত ঘর। কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যায় নীচে—অনেক নীচে সরু রেখায় তটিনী বয়ে চলেছে—পর্বত-কন্যা তিস্তা। আর দিগন্ত জোড়া শুধু পাহাড় আর পাহাড়। উত্তর দিকের জানলা দিয়ে নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও দেখা যাবে।

ভারি পরিচ্ছন্ন ঘরখানি। খুব পছন্দ হয়েছে রাগিনীর। ঝক ঝকে পালিশ করা মেজেয় মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। একটা ড্রেসিং টেবিল। কাপড়-জামা রাখবার আলনা একটা। একটা লম্বা কৌচ। খুব আরামে শোওয়া যায় তাতে। রাগিনী বসতে গিয়ে দেখে—স্প্রিং-এর সীট অনেক খানি নেমে যায়। একখানি কুশন চেয়ার—ছোট্ট একটি রাইটিং টেবিল। আর ঘরের দেওয়ালে নানা রকমের সুন্দর ছবি।

দৃষ্টির এক লহমাতেই ঘরখানি ভালো লাগে। আভিজাত্যের ছোঁওয়ায় মন ভরে যায়।

সবচেয়ে আরামদায়ক সিঙ্গেল সিটেড ছোট খাটখানির পরিচ্ছন্ন বিছানা। যেমন পরিষ্কার তেমনি উজ্জ্বল। পরিশ্রান্ত দেহটাকে এই পরিচ্ছন্ন বিছানায় এলিয়ে দিয়ে মনে মনে আর একবার ধন্যবাদ জানায় রাগিনী কাঞ্চনকে।

পুরোপুরি দু'দিনের পথ ক্লান্তি। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কথা রাগিনীর। কিন্তু কোথা থেকে কী যেন মনে আসে তার। ঘুম ঠিক আসে না। চোখের পাতা দুটি বোজানো; কিন্তু সত্যিকারের ঘুম কোথায়? তন্দ্রার ভাব খানিকটা আছে; ঘুম তাকে বলা যায় না।

রাগিনী কী স্বপ্ন দেখছে? না, চেতনা তার আছে। স্বপ্নের অচৈতন্য ভাব তো নয়। তবু জেগে নেই রাগিনী। নিশ্চয়ই সে জেগে নেই। জেগে থাকলে এমনি সময় হঠাৎ তার মনে এখন এ-কথার উদয় হচ্ছে কেন? কালিম্পং-এর এমন জায়গা থেকে দেওঘরের বম্পাস টাউনেই বা সে চলে যাবে কেন? আর সবাইকে ছাড়িয়ে পুলকেশের কথাই বা তার মনে পড়বে কেন? পার্ক সার্কাসের বাড়ির কথা—বাপ-মা, ভাই-বোনের কথা মনে পড়ল না। আপিসের সহকর্মীদের কাউকেই মনে পড়ল না। এমন কী যার সৌজন্যে এমনি একটা উন্নত জীবনের আস্বাদে মন তার ভরপুর—তার কথাও চাপা পড়ে গেল। কাঞ্চনের পাশে হঠাৎ পুলকেশ এসে দাঁড়াল কেন? কাঞ্চনকে অতিক্রম করে গেল সে।

দেওঘরে একবার গিয়েছিল রাগিনী। পুজোর ছুটিতে মাসিমার সঙ্গে।

মাসিমা গিয়ে উঠেছিলেন তাঁর এক বড়লোক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি—বম্‌পাশ টাউনে। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের সেকেণ্ড ক্লাস লেডীস্ কম্পার্টমেণ্ট থেকে নামতেই যে ছেলেটি এসে হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল—সে হচ্ছে পুলকেশ মুখার্জী। মাসিমার পিসতুতো ননদের ছেলে। সুন্দর সুঠাম গড়ন—মুখখানিতে ভারি কমনীয়তা। আর তারই জন্যে স্বভাবটি মধুর। একটু মেয়েলি ভাবাপন্ন। সুঠাম দৈহিক গড়নের সঙ্গে স্বভাবের এখানে একটু বিরোধ বটে; কিন্তু তেইশ বছরের এই কোমল যুবকটিকে সতের বছরের কুমারী রাগিনীর ভালো লেগেছিল।

স্টেশন থেকেই ট্যাক্সিতে চেপে বম্‌পাস টাউনে 'মধু-স্মৃতি'ত পৌঁছাল তারা। মাসিমার ননদের নিজের বাড়ি সেটা। ননদাই বিহার গভরমেণ্টের বিশিষ্ট রাজকর্মচারী। বাড়িটা বেশ। যেমন ঝক্‌ঝকে তেমনি সুদৃশ্য।

মাসিমাকে দেখে তাঁর ননদ অত্যন্ত পুলকিত হলেন—কী সৌভাগ্যি দিদি আপনি এসেছেন!

শুধু আমি একলা নই রে বিনোদিনী। সঙ্গে আবার কে দেখ।

ওমা তাইত!

মাসিমার কথায় রাগিনী বিনোদিনী দেবীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল।

মাসিমা রাগিনীকে উদ্দেশ করে বললেন, ইনিও তোমার মাসিমা।

রাগিনীর চিবুক ধরে চুমা খেয়ে বিনোদিনী দেবী আশ্বাস দিলেন, পর নই মা তোমার।

কি খুসি সকলে। আর কী আনন্দ!

পুলকেশ বললে, আমি কী হলাম?

মাসিমা উত্তর দিলেন, কেন দাদা !

কই দাদা বলে আমাকে তো এখনো প্রণাম করে নি আপনার বোন ঝি।

পুলকেশের কথায় ভারি অপ্রস্তুত হয়েছিল রাগিনী। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে সে প্রণাম করলে। পুলকেশের পায়ের আঙুল স্পর্শ করতে তার হাতখানি কেমন না জানি একটু কেঁপে উঠেছিল।

পুলকেশের কী উচ্ছ্বাস তখন! কোন ঘরে থাকবে তাই নিয়ে কত মাথা-ব্যথা!—ওই উত্তরের ঘরটিই ভালো মা। ও ঘরের জানালা দিয়ে কেমন ত্রিকূট দেখা যায়!

ত্রিকূট সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না রাগিনীর। প্রশ্ন করলে, সে আবার কী ?

ত্রিকূট জানো না ? চলো দেখবে চলো।

তক্ষুনি রাগিনীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পুলকেশ, উত্তর দিকের ঘরে। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের উজ্জ্বল আলোকে দেখিয়েছিল—ত্রিকূট। ধূসর পাহাড়ের ঢেউ খেলানো রূপ।

রাগিনীর জীবনে সেই প্রথম পাহাড় দেখা।

কী আনন্দই না পেয়েছিল রাগিনী সেদিন।

পূর্ব বাংলার নদী-মাতৃক ভূমিতে অধিবাস। জন্মকাল থেকে নদীর সঙ্গে পরিচয়। নদ-নদী, খাল-বিল—বর্ষায় জলপ্লাবিত গ্রাম। যদিও বেশিদিন সে বিক্রমপুর থাকেনি। বার বছর বয়েস থেকেই সে কলকাতায়। মাসি গিয়েছিলেন পূজোয় তাদের বাড়িতে বিক্রমপুরে। কী চোখে যে দেখলেন তাকে। মেসোমশাই তখন বেঁচে। কলকাতায় কোন ইংরেজ সওদাগরী অপিসের বড়বাবু। নিঃসন্তান। স্বামী স্ত্রীতে থাকেন; সংসারে আর কেউ নেই। মেসোমশাই নির্ঝঞ্ঝাটে লোক।

এক ভাই তাঁর অবিশ্যি আছে। তাঁর থেকেও ছোট; কিন্তু দজ্জাল ভ্রাতৃ-বধূ। মাসিমার সঙ্গে কিছুতেই বনিয়ে থাকতে পারে নি। তখনকার দিনেই কলকাতায় পার্ক সার্কাসে মেসোমশাই বাড়ি করেছেন। স্বামী-স্ত্রী আর চাকর-ঠাকুর এই নিয়েই সংসার। সে সংসার বড্ড ফাঁকা।

মায়ের পিস্‌তুতো বোন মাসি। সদা হাসি-খুসি, ভারি ভালো মানুষ আর ভারি আমুদে। বার বছরের মেয়ে রাগিনীর সঙ্গেই জমে গেলেন খুব। রাগিনীর বাপ জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারি। ঘুষ-ঘাস নিয়ে তখন ফেঁপে ওঠা সংসার। জমি-জায়গাও কিছু করেছেন। ক্ষেতের চাল, পুকুরের মাছ, বাড়ির গরুর খাঁটি দুধ—মেসো-মাসি ভারি আপ্যায়িত হলেন। একমাস প্রায় ছিলেন: সর্ব্বক্ষণ রাগিনী তাঁদের কাছে কাছে থাকত, যাবার সময় মাসির চোখ ছল ছল করে উঠল। মাকে বললেন তিনি—তাই তো নলিনী, কলকাতায় গিয়ে রাগিনীকে ছেড়ে কেমন করে থাকব? মেয়েটা এত নেওটা হয়ে গেছে। নাঃ; তোর এখানে না এলেই ছিল ভালো।

মা বললেন—তার জন্যে আর দুঃখ কেন শোভনা দি? রাগিনীকে তুমি নিয়ে যাও।

প্রথমটায় কথার সুরে হালকা ভাব ছিল। ক্রমশঃ তা গভীরতায় ভরে উঠল।

সত্যি বল্‌ছিস?

ওমা, তোমার সঙ্গে কী মিছে কথা বলছি নাকি?

রাগিনীকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি?

কেন পারবো না? ওকে তো আর পরের হাতে বিলিয়ে দিচ্ছি না? বাপ-মায়ের কাছে না থেকে থাকবে মেসো-মাসির কাছে। এতে আর অসুবিধে কোথায়?

ও কিন্তু আমার মেয়ে হয়ে যাবে।

যাক না! ও-ছাড়াও তো আমার আরো ছেলে মেয়ে রয়েছে।

তবে পাকা-পাকি কথা-বার্তা কয়ে নে।

শোভনা মাসির কথা শুনে মা হেসে গড়িয়ে পড়লেন—কাঁচা কথা বলেছি নাকি?

না। তবুও—

তবুও আবার কী? দলিল দস্তাবেদ বানাতে হবে নাকি? বলো তো উকিল ডাকি না হয়।

নারে, ঠাট্টার কথা বলি নি।

মাও গভীর সুরে বলেন—আমিও ঠাট্টা করিনি শোভনাদি। তোমার ছেলে-পিলে নেই। নাও না কেন একটা মেয়েকে! মানুষ করে দিও।

প্রস্তাব শুনে মেসোমশাইও খুসি হলেন। সেই থেকেই জীবনের পট পরিবর্তন।

নদী-মেখলা দেশ থেকে শহরের রাজপথ। দু'চোখ ভরা সবুজ ধানের ক্ষেত আর নেই। নেই প্রশান্ত আকাশের বিস্তার। তবু ভালো লেগেছিল রাগিনীর। দু'পাশে বিনুনি ঝুলিয়ে স্কুলের গাড়িতে চেপে মেম-সাহেবের স্কুলে পড়তে যাওয়া। জনারণ্য মহা-নগরী। তাই বেশি করে আকর্ষণ করেছিল রাগিনীকে। তের বছরের মেয়ে রাগিনী—গ্রাম দেখলে তখন থেকেই নাক সিঁটকাতো—ম্যাগো, কী বিচ্ছিরি গাঁ। এখানে আবার মানুষে থাকে! ইলেকট্রিক আলো নেই—টিমটিমে লণ্ঠনের আলো!

বিক্রমপুরের বাড়ি আর তার ভালো লাগে না। ছুটিতে বাপ-মায়ের কাছে এলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে যেন। দু'চার দিন থাকতে না থাকতেই পালাই-পালাই ডাক ছাড়ে রাগিনী।

মা বলেন—তুই হলি কী রাগিনী? দু'দিনেই একেবারে শহুরা মাইয়া।

রাগিনী উত্তর দেয়—তা কী করব? তোমাদের এখানে ভয়ানক গরম। টিনের চাল—ছাদ নেই কিছু না। আর পাখা না হলে আমি থাকতে পারি নে।

দু'চার বছর বাদে রাগিনী ছুটিতে আর বিক্রমপুর আসত না। মাসিও তাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। আর তার নিজেরও ভালো লাগত না।

বাপ খুসিই ছিলেন। জমীদার-সেরেস্তার হিসেবী লোক। রাগিনী যদি মন জুগিয়ে থাকতে পারে তা হলে শুধু তারই মঙ্গল নয়। সমস্ত সংসারটাই তাঁর তাতে উপকৃত হবে। বিয়ে-থা দিয়ে দেবে মাসি। শুধু তাই নয়, চাই কী কলকাতায় পার্ক-সার্কাসের বাড়িখানি পর্যন্ত।

রাগিনী বড় আনন্দেই ছিল।

ম্যাট্রিক পাশ করবার আগেই মেসো পরলোক গমন করলেন। রাগিনী হল মাসির চোখের মণি।

সেই সময় আর একবার বিক্রমপুরে মাসি এসেছিলেন রাগিনীকে সঙ্গে নিয়ে। মাস খানেক ছিলেন। কথায় কথায় মা বলেছিলেন—শোভনা দি, এইবার মেয়ের বিয়ে দেওয়া কী ভালো নয়?

রাগিনী তখন পনের বছরের কিশোরী। চোখে-মুখে আসন্ন যৌবনের রঙ্ লাগতে সুরু হয়েছে। কিন্তু বিয়ের কথা তখনো পরিপক্ক ভাবে ভাবতে শেখে নি।

মাসি বললেন—ক্ষেপেছিস? এর মধ্যে বিয়ে কী?

পনের বছর বয়েস হল যে রাগিনীর।

আজকালকার দিনে মেয়েদের আবার পনের বছর বয়েস নাকি?

তোদের সময়—আমাদের সময় তা ছিল বটে। এখন আর তা নেই।

তা মেয়ে তোমার করবে কী?

কেন? পড়াশুনা করবে। ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম-এ পর্যন্ত।

তারপর?

তারপর বিয়ে করে ঘর-সংসার করবে।

বিয়ে করে ঘর-সংসারই যদি করতে হয়, তবে আর এত পাশ করে কী হবে?

তা তুই বুঝবি কী? তোরা পাড়াগাঁয়ে থাকিস, লেখাপড়ার মর্যাদা তোরা বুঝবি কেমন করে?

মা বলেছিলেন—হ্যাঁ। তা বটে! তবে তোমার থেকে আমার সংসার-বুদ্ধি অনেক। ওই মেয়ে তোমার করবে এম-এ পাশ? তোমার যেমন আকাশ-কুসুমের কল্পনা?

মায়ের কথায় মাসি জবাব দিয়েছিলেন—তুই তো সব জানিস্? দেখিস এম-এ পাশ করে কিনা? এবারের পরীক্ষার রেজাল্ট জানিস্? রাগিনী সেকেণ্ড হয়েছে।

মেয়ের কৃতিত্বে লেখাপড়া না-জানা মাও বিস্ময়ের গর্বে মাসির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

সেইবারেই রাগিনী ফার্ষ্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল।

বাবাও একদিন শোভনা মাসিকে উপদেশ দিয়েছিলেন—রাগিনীর জন্যে পাকা-পাকি কিছু ব্যবস্থা করে রাখবার জন্যে।

মাসি হেসে বলেছিলেন—জমিদারি সেরেস্তায় চুল পাকালেও আমাকে এ-বিষয়ে উপদেশ দিতে এসো না ললিত। বৈষয়িক বুদ্ধি আমার কিছু কম নয়।

মুখে হাসি থাকলেও কণ্ঠস্বরে তাঁর একটু শ্লেষের উত্তাপ ছিল। জীবিত কালেই সব হাত-ছাড়া করা উচিত নয়। মৃত্যু সন্নিকট হলে তখন বুঝে-সুঝে কাজ করবেন।

ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে আই-এ পড়বার সময় মাসির সঙ্গে রাগিনী গেল দেওঘর। মেসোমশায়ের মৃত্যুর পর মাসি এক নাগাড়ে বেশি দিন থাকতে পারতেন না। প্রাণ তাঁর হাঁপিয়ে উঠত!

দেওঘরের বমপাশ টাউন। ঝাউগাছ ঘেরা লাল সুরকির রাস্তা—পিছনে বিক্ষিপ্ত শিলা স্তূপ। সামনে নন্দন-পাহাড় আর উত্তরে ত্রিকূটের ধূসর রেখা। আরো পাহাড় আছে—চোল পাহাড়। ধারোয়ার ঝির ঝিরে জল পার হয়ে সেখানে যেতে হয়।

ভারি আনন্দ পেয়েছিল রাগিনী দেওঘরে। পুরো দেড় মাস ছিল সে সেখানে। মধু পুলকেশের বড় ভাই। শোভনা মাসির পিস্তুতো ননদের বড় ছেলে। সেই ছেলের পর পুলকেশ। মধুর ভাই পুলকেশ। নামে মিল নেই; কিন্তু সামঞ্জস্য আছে। মধু চার বছরের ছেলে। প্রথম সন্তান বলে মধুর মতনই মিষ্টি; কিংবা মধুসূদনের অপভ্রংশও হতে পারে। সেই ছেলে চার বছর বয়েসে মারা গেল। শোকাচ্ছন্ন পরিবারে তখন নব-পুলকের সঞ্চার করলে পুলকেশ। শূন্য মাতৃ-ক্রোড়ে এল পুলকেশ। তারপর আর কোন সন্তানাদি নেই।

পুলকেশ তখন তেইশ বছরের তরুণ যুবক। বি-এ পাশ করেছে। বাপের ইচ্ছা এইবার কাজে ঢোকাবেন। দু'চার দিনের মধ্যেই রাগিনীর সঙ্গে জমে গেল সে। তপোবনে গিয়ে পিকনিক করা, নন্দন-পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া, ধারোয়া পার হয়ে নির্জন-পথে চোল পাহাড়ে বৈকালিক ভ্রমণ—প্রতিটি দিন যেন মাধুর্যে ভরা।

হৃদয়-বিনিময়ের পালা ঘটল—ত্রিকূটে। পাহাড়ের অরণ্যময়

নির্জন প্রকৃতির মাঝে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখলে—একই ভাব দুজনের চোখে-মুখে।

মাসিমা, মাসিমার ননদ আর মেসোমশাই ছিলেন সঙ্গে অবিশ্যি; কিন্তু এত তাড়াতাড়ি পুলকেশ আর রাগিনী পাহাড়ে উঠতে লাগল যে তাদের নাগাল পাওয়া ভার।

পাহাড়ের ওপরে একটি গুহা—নীচে অধিত্যকা। সেই অধিত্যকার দিকে মাথা নীচু করে তাকাতে গিয়ে দুজনে পরস্পরের ঘন সন্নিবেশে সরে এল।

আমার মাথা ঘুরছে পুলকেশ দা, নীচের দিকে তাকাতে গিয়ে। শীগ্‌গীর ধরো আমাকে—না হলে এক্ষুনি পড়ে যাব।

পুলকেশের দৃঢ়বদ্ধ বাহু দুটিতে ভীতা সন্ত্রস্তা রাগিনী সেদিন ধরা পড়েছিল।

আঃ, ছাড়ো না!

রাগিনীর এ কথায় পুলকেশ তাকে আরো কাছে টেনে বলেছিল—কেন, তুমিই ত ধরতে বললে।

ধরতে বললাম, ভয় করছিল তাই। মাথা ঘুরে যাতে পড়ে না যাই।

এখন আর ভয় করছে না? মাথা ঘুরছে না?

পুলকেশের কথায় রাগিনী বললে—না। নীচে কি ভীষণ অন্ধকার। ওই অন্ধকার যেন আমাকে টানছিল।

পুলকেশ জিগ্যেস করলে—এখন কে টানছে?

যাও, তুমি ভারি দুষ্টু!

পুলকেশের মনে তখন রঙ্‌ ধরেছে। রাগিনীর মুখখানিকে কাছে টেনে নিয়ে বললে—তোমাকে এমনি করে যদি চিরদিন কাছে টানতে পারতাম রাগিনী তা হলে—

তা হলে কী ?

তাহলে কোন অন্ধকারই আর তোমাকে গ্রাস করতে পারত না !

রাগিনীর মনে তখন আষাঢ়ের নব মেঘোদয় ।

নীচে থেকে হাঁক ডাক শোনা গেল । পুলকেশের বাবা আর মা চীৎকার করছেন । পাহাড়ের এত উঁচুতে ওঠবার সামর্থ তাঁদের নেই । শোভনা মাসিও তাই । আশঙ্কা জাগল সবার মনে—ছেলে মেয়ে দুটো অত উঁচুতে উঠেছে—কখন কী হয় ! আর উঠেছেও অনেকক্ষণ ।

সেই রাত্রে ত্রিকূট থেকে ফিরে 'মধু-স্মৃতি'র উত্তরদিকের ঘরে অতি সুখের ঘুম ঘুমিয়েছিল রাগিনী । সমস্ত দিন পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত শরীর আর মনের অতি উন্মাদনায় বড় আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে । আর কী নরম বিছানা ! আর কী পরিচ্ছন্ন ।

খোলা জানালা দিয়ে খানিকক্ষণ আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রাগিনী । রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত । কিন্তু সেই অন্ধকারের মাঝে ত্রিকূট কোথায় ? ঘন অন্ধকারের ঘন ছায়ায় ত্রিকূটের ধূসরতা ঢাকা পড়ে গেছে । দিগন্ত-ঘেরা শুধু অন্ধকার । সেই অন্ধকারের মাঝে আর সব কিছু যেন ডুবে যায়—শুধু ভেসে ওঠে ত্রিকুটের উপত্যকার নীচে সেই সুড়ঙ্গ—সেই খদ্ । অন্ধকারাচ্ছন্ন শুধু অধিত্যকা । রাগিনী আশ্চর্য হয়ে যায়, সব কিছু ছাড়িয়ে শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন অধিত্যকা তাকে টানে কেন ? জীবনের প্রথম আলোক-লগ্ন । পুলকেশের স্পর্শ এখনো সে অনুভব করছে । কী উন্মাদনাময়—আশ্চর্য উন্মাদনাময় । অন্ধকার খদের দিকে তাকিয়ে যখন তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল তখন পুলকেশের স্পর্শে সে নতুন এক আলোর সন্ধান পেয়েছিল । শুধু আলো নয়—রাশি রাশি আলো । আলোকের অজস্র প্লাবন ।

নরম পরিস্কার বিছানায় শুয়ে আর একবার সেই আলোর স্পর্শানুভূতিকে গ্রহণ করতে চায় রাগিনী।

আশ্চর্য, যখন সে চোখ মেললে তখন সে দেখলে জানালা দিয়ে অজস্র আলো ছড়িয়ে পড়েছে 'মধু-স্মৃতি'র উত্তরের ঘরে। মেঝেয় যে সূর্যালোক—তার সোনালী রঙ তার বিছানাকে পর্যন্ত ছুঁয়ে আছে।

ওঠ। আর কতক্ষণ ঘুমোবে ?

তাইত। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে রাগিনী।

বেলা কত হয়েছে বলো ত ?

পুলকেশের কথায় আরো লজ্জা পেয়ে যায় রাগিনী।

কী ঘুম ঘুমোতে পারো ? চল বেড়াতে যাবে না ?

আড়ামোড়া পিটতে লাগল রাগিনী। পুলকেশের ডাক সে শুনেছে, কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না তার।

কী হল ? আবার পাশ ফিরে শুলে যে ?

ভারি আরাম লাগছে শুয়ে থাকতে। পুলকেশের কথার উত্তরে রাগিনী বললে।

এখানে কী তবে শুয়ে থাকতেই এসেছ ?

না, তা নয়।

তবে ?

যা নরম বিছানা ; তাই ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না।

তাহলে শুয়ে থাক তুমি।

না, তা কেন ?

তাহলে ওঠ। চলো আজ নন্দন পাহাড়ে যাব।

কে, কে ?

তুমি আর আমি।

তুমি আর আমি? অদ্ভুত একটা সুরের তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠল রাগিনীর মনে।

শুনছেন?

আবার কীসের ডাক? রাগিনী তো দিব্যি আরামে শুয়ে আছে। নরম তুলতুলে বিছানা। ভারি পরিচ্ছন্ন আর ভারি রুচিকর। কতদিন যে এমন বিছানায় শোয়নি রাগিনী!

শুনছেন? আরো চেঁচিয়ে ডাকলে কাঞ্চন।

রাগিনী এবার আর অবচেতনায় নয় স্পষ্টই শুনতে পেলে কাঞ্চনের সম্ভাষণ। নিদ্রালু চোখ মুছে তাকিয়ে দেখলে সে। একী? অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! বমপাস টাউনের 'মধুস্মৃতি'র উত্তরের সে-ঘর কই? কোথায় বা সেই ত্রিকূটের ধূসর রেখা।

আচ্ছা ঘুমোচ্ছেন যা হোক! একেবারে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা!

তাইত। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে রাগিনী।

বেলা কত হয়েছে জানেন?

কাঞ্চনের কথায় লজ্জিত হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে রাগিনী। হিমালয়ের পর্বত-সৌধ রঙে রঙে ভরে গেছে। দিগন্ত ঘিরে শুধু রঙের মেলা। এত রঙ এল কোত্থেকে? তু'চোখ ভরে রঙের মায়া কাজল লাগল নাকি?

রাগিনী তবু উঠল না। উঠি উঠি করেও কেমন যেন তার উঠতে ইচ্ছে করছে না।

ওকি, আবার পাশ ফিরে শুলেন যে?

কাঞ্চনের কথায় এবার সত্যি লজ্জা পেয়ে গেল রাগিনী—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। না?

সুন্দর প্রশ্ন আপনার। কি রকম ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—তা কি

আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে ? ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন না !

ইস্, তাইত ! বড্ড বেলা হয়ে গেছে যে। একী ? পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি ! আমাকে ডাকেন নি এতক্ষণ ?

রাগিনীর কথায় হেসে ওঠে কাঞ্চন—বাঃ, এ যে পাল্টা আক্রমণ দেখছি !

না, সত্যিই বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল।

তার জন্যে কী আমি দায়ী ?

দায়ী আপনাকে কে করছে ? আরো দেড় ঘণ্টা আগে তো ডাকতে পারতেন !

দেড় ঘণ্টা আরো পরে ডেকেই তো এই অবস্থা। দেড় ঘণ্টা আগে ডাকতে এলে না-জানি কী কুরুক্ষেত্রেরই না সৃষ্টি হত !

বেশ। আর তর্কে কাজ নেই। আমার দোষটা কী ? এত নরম বিছানা আপনাদের—তাইতেই এই ঘুমের ঘটা।

আচ্ছা, উঠুন এখন। এর পরেই আপনার বিছানা পাল্‌টে দেবার ব্যবস্থা করছি। কিছু পাথরের নুড়ি বিছিয়ে দিতে বলি, কেমন ?

কাঞ্চনের কথায় আশ্চর্য হয়ে যায় রাগিনী। সবিস্ময়ে বলে—তার মানে ?

তার মানে অত্যন্ত সহজ। দুই আর দুইয়ে চার।

হেঁয়ালী ছেড়ে সহজ সরল ভাষায় বলুন।

রাগিনীর কথায় কাঞ্চন বললে—এ আর বুঝলেন না ? পাথরের নুড়ি থাকলে বিছানার কোমলতা আর থাকবে না। আপনাদের কবির ভাষায় যাকে বলে বন্ধুর, এ শয্যা হবে বন্ধুর। আর তাহলে ঘুমও কমে যাবে।

এতও পারেন আপনি !—কথায় আপনার এত রঙও থাকে !

কথার রঙকে ছেড়ে এখন বাইরের প্রকৃতির রঙ্ লক্ষ্য করুন।

কাঞ্চনের কথায় বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল. রাগিনী—সুপার! অপূর্ব!! আচ্ছা এতো রঙের মেলা কেন?

কালিম্পং-এর সূর্যাস্ত। এ-রঙের আর তুলনা নেই। কিন্তু আর না, উঠে পড়ুন এবার। চা-খাওয়া এখনো আমার হয়নি।

সে কী? কেন?

বারে, অতিথি সৎকার না করে আগে থেকেই ও-পাট সারি কেমন করে?

এত অতিথি-প্রীতি আপনার?

এটা আমাদের ভারতের সনাতন আদর্শ। আমি সেই ট্রাডিসনকেই বহন করে চলেছি মাত্র।

ছিঃ ছিঃ! না, ভারি অন্যায় করেছেন আপনি। চলুন এক্ষুনি যাচ্ছি চায়ের টেবিলে – মাত্র আর পাঁচ মিনিট লাগবে।

পাঁচ মিনিটে হল না। আরো চল্লিশ মিনিট লাগল রাগিনীর।

বমপাস টাউন থেকে কালিম্পং—অনেক পথের ব্যবধান। কালেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে বইকি! মাসির আদুরে মেয়ে তখন রাগিনী, জীবনে অভাব বলতে কিছু ছিল না। সতের বছরের অনূঢ়া বর্ণাঢ্য তরুণী; চোখে তখন স্বপ্ন, মনে তখন রঙ্। সেদিনের স্মৃতিতে মন ভরপুর হয়ে ছিল রাগিনীর। হাল্কা হাওয়ায় খানিকটা ভেসে ভেসে বেড়ানো আর কি!

সতের বছর থেকে আরো ছ বছর কেটে গেছে। ফার্ষ্ট ইয়ারের আর্টসের ছাত্রী ফোর্থ ইয়ার পার করে বাস্তবের ধূলি ধূসরিত রাজপথের যাত্রী। জীবনে এখন আর কল-কাকলী নেই। আছে কলরব।

জন প্রবাহের তরঙ্গ—জনসমুদ্রের কল্লোল, মিছিলের কলরোলে জীবন এখন কোলাহল-মুখর। এখন আর সময় কই রাগিনীর সূক্ষ্ম সুরের কলতান তোলার? জীবনের প্রতিটি মূহূর্ত হিসেব-করা। মেপে কথা বলা—হিসেব-করে কাজ করা।

হিসেবের বাইরে চলে এসেছে আবার রাগিনী। শহরের জনতা আর নেই, নেই জীবনের বাঁধা-ধরা রুটিন। মেঘ আর রঙ্—হিমালয়ের নৈসর্গিক পরিবেশ আজ তার মনকে আবার উন্মনা করে তুলছে। তেইশ বছরের রঙ্-চটা জীবন থেকে সে আবার ফিরে গেছে সেই সতের বছরের বর্ণ-সুষমামণ্ডিত দিনগুলিতে। কালিম্পং থেকে দেওঘরের বমপাশ টাউন তাই এত কাছাকাছি।

বাথরূমে ঢুকে তাই ভালো করে মুখখানিকে পরিষ্কার করে ধুয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখে রাগিনী—চোখের কোণের কালিমাটুকু আজ যেন ঢাকা পড়ে গেছে। দিবা নিদ্রাব আমেজ এখনো মুখে-চোখে তার জেগে রয়েছে। ফোলা ফোলা মুখ-চোখ যেন ভালই লাগছে।

বাথরূম থেকে বেরিয়ে সাজতে বসল রাগিনী।

সস্তা দামের টয়লেট—তবুও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে তাই দিয়েই প্রসাধন করলে সে। চোখ দুটিতে সূক্ষ্ম রেখায় সূর্মা টেনে দিলে। অনেকবার ধরে স্নো ঘষে ঘষে মুখখানিকে পরিষ্কার করলে সে। তারপর গোলাপী-রঙের ফেস্-পাউডার লাগিয়ে ব্রাস টানতে লাগল।

এইবারে পরিচ্ছদ-সজ্জার পালা।

বেশি শাড়ী সে সঙ্গে আনে নি। সাধারণ ব্যবহার্য মাত্র কয়েক-খানি। আর সঙ্গে আছে তার মাসিমার দেওয়া একখানি আকাশী-রঙের জার্জেট। এই রঙ্টিতে তাকে নাকি ভারি মানায়! অন্ততঃ পুলকেশের চোখে। তার শ্যামলী চেহারায় আকাশী রঙ্ নাকি ভারি

সুন্দর ম্যাচ করে।

পুলকেশ এই শাড়ীখানিকেই তারিফ করেছিল—তোমার রুচির প্রশংসা করি রাগিনী। কি সুন্দর তোমার শাড়ীর রঙটি। এত সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে!

উত্তরে রাগিনী বলেছিল, ও তোমার চোখের রঙ্।

শুধু চোখের রঙের নয়—মনের রঙ্ও।

শাড়ীখানি সত্যিই সুন্দর। মাসিমার সঙ্গে নিজে গিয়ে নিউমার্কেট থেকে পছন্দ করে কিনেছিল সে। গায়ে পরবার জন্যে পছন্দ করল রাগিনী একটি কমলা-নেবু রঙের উজ্জ্বল ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ব্লাউস্। ব্লাউসটি অবিশ্যি সাম্প্রতিক কালের কেনা।

ব্লাউসটি গায়ে দিলে রাগিনী। কিন্তু শাড়ীর ব্যাপারে খানিকটা ভাবতে হল তাকে। আকাশী রঙের জার্জেট—না, অন্য কিছু? কোন্ শাড়ী পরবে সে?

আকাশী রঙের জার্জেটটাই যদি সে পরিধান করে! ছ'বছর বাদে আকাশী-রঙ্কেই যদি সে আর একবার স্পর্শ করে—তা হলে এমনই বা কী ক্ষতি? মন তার আজ সেই রঙ্কেই তো ছুঁতে চায়!

ছ'বছর আগেকার পাটকরা শাড়ীখানিকে অকারণেই রাগিনী সঙ্গে করে এনেছে। কে জানত—এমন দিনে ওই শাড়ীখানির কথাই তার মনে পড়বে!

স্যুটকেশ খুলে রাগিনী সেই শাড়িখানিকেই বার করল। ভাঁজে ভাঁজে তার ন্যাপ্থলিন দেওয়া। বহু যত্ন করে সে এটিকে রেখে দিয়েছে। মাসিমার স্মৃতি আর পুলকেশের স্পর্শ।

কিন্তু কী বিশ্রি গন্ধ ন্যাপথলিনের! খানিকটা সেণ্ট ঢেলে নিলে শাড়ীখানিতে। তবুও গন্ধ যেন যায় না। তা না যাক্! স্থানে

স্থানে বিবর্ণ রঙ্। উজ্জ্বল নীলাকাশের রঙ্ ছ'বছর বাদে আজ খানিকটা ফিকেও হয়ে এসেছে। শাড়ীখানির সব জায়গাতে রঙের সমতা আর নেই।

শাড়ীখানিকে আবার পাট করে রেখে দিলে রাগিনী—থাক্, এটা তোলাই থাক্! তার চেয়ে না হয় নাইলনই একখানি পরা যাক্! আকাশী রঙের শাড়ী আর তার নেই। ধূসর ধোঁয়াটে রঙের নাইলন শাড়ী। রাগিনী ভাবে, তাই বা মন্দ কী? এ রঙটাতেও তাকে নাকি মানায় ভালো। অন্ততঃ তার আপিসের সহ-কর্মীদের চোখে।

যেদিন প্রথম সে এই শাড়ীখানি পরেছিল অনেকের অনেক মন্তব্য তার সেদিন কর্ণগোচর হয়েছিল।

মিস্ চ্যাটার্জীর বোধহয় আজ পাকা-দেখা! রসিকতা প্রকাশ করে-ছিলেন আধবুড়ো রেকর্ড-কীপার।

না, শাড়ীটা বোধহয় জন্মদিনে ওঁর কোন বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পাওয়া!—বলেছিল ডাকবাবু।

ডাকবাবু অর্থাৎ ডেস্‌প্যাচারের তবু অন্তর্দৃষ্টি আছে। এই শাড়ী-খানিও রাগিনীর পছন্দ-মাফিক। আর এ-টাও তার উপহার পাওয়া।

ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওঁকে। ধোঁয়াটে রঙে এত সুন্দর ম্যাচ করেছে! প্রশংসাবাদ জানিয়েছিল তরুণ টাইপিষ্ট।

সত্যিই ধোঁয়াটে রঙে তার শ্যামলাঙ্গ মানায় মন্দ নয়—আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলে রাগিনী।

কিন্তু বড্ড ধূসর রূপ। কলকাতার রাস্তায় ট্রামে, বাসে, রঙ্‌টিকে মন্দ লাগে না। ঘরের মধ্যেও বেশ দেখায়। ঘরের বাইরে কালিম্পং-

এর পাহাড়ের মাথায় অজস্র রঙের বাহার—সেখানে যেন এ-রঙটি বড্ড বেমানান। কাঁচের জানালা দিয়ে বহিঃপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রাগিনীর অন্ততঃ তাই মনে হল। তাই ধূসর-রঙের নাইলন পাল্টে নিয়ে শোভনা মাসির দেওয়া নীল জার্জেটটাই পরিধান করলে সে। নীল-রঙের সেই পূর্বেকার জৌলুষ না থাকলেও—মন্দ লাগছে না তাকে শাড়ীটাতে। ফিকে নীলের নীলাভ বর্ণে আকাশের সুনীল রঙ—না, এইটেই ভালো।

বদ্ধ ঘরের কপাট বন্ধ। রাগিনীর সাজ আর হয় না। শাড়ীটিকে নিয়েই যত ভাবনা তার।

বাইরে থেকে কাঞ্চনের গলা শোনা গেল—পাঁচ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট পার হয়ে গেছে কিন্তু মিস্ চ্যাটার্জী।

রাগিনী লজ্জিত হয়ে উঠল—এই যে, যাচ্ছি। হয়ে গেছে আমার। এবারে খুব তাড়াতাড়ি শাড়ীটাকে পালটে নিয়ে পরণের কাপড়খানি আলনায় গুছিয়ে তুলে রাখলে রাগিনী।

চা না খেতে পেয়ে মাথা কিন্তু ধরে গেল। কাঞ্চন আবার তাগিদ দিলে।

খুট্ করে দরজার অর্গল খুলে বার হয়ে এল রাগিনী। অঙ্গসজ্জায় এমন কিছু চাক্‌চিক্য নেই, অসাধারণত্ব তো একেবারেই নেই—তবু তার দিকে কাঞ্চন খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখলে; সত্যিই মন্দ দেখাচ্ছে না রাগিনীকে। লজ্জিত কণ্ঠে রাগিনী বললে—চলুন, চলুন, চায়ের টেবিলে। ছিঃ, ছিঃ, মিছি মিছি দেরি করলেন আপনি।

বিস্ময় বিভূষিত কণ্ঠে কাঞ্চন জিগ্যেস করলে—আমি ?

হ্যাঁ, আপনিই তো। ঘণ্টা খানেক আগে ডেকে দিলে এত দেরি তো আর হত না।

দুজনে গিয়ে চায়ের টেবিলে বসলে পাশাপাশি। পাহাড়ী পাচক চা আর কিছু খাবার সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। কাঞ্চন আর রাগিনী দুজনের কেউই তা গ্রহণ করলে না। অনেক বেলায় খাওয়া হয়েছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রাগিনী জিগ্যেস করলে, বৌদি কোথায়?

তিনি বেরিয়েছেন, তপোবন।

তপোবন!—দেওঘরের তপোবন ঝলমলিয়ে ওঠে রাগিনীর চোখের সামনে। জিগ্যেস করলে—সে আবার কোথায়?

কাঞ্চন উত্তর দিলে—এই কাছেই; বৌদির এক বান্ধবীর বাড়ি।

তপোবন বাড়ির নাম?

হ্যাঁ। গার্হস্থ্যাশ্রম—সাধন-পীঠ নয়।

দুজনেই এ কথায় এক সঙ্গে হেসে উঠল।

পাঁচ

ছোট্ট কালিম্পং শহরটা ঘুরতে কতই বা আর সময় লাগে ? পথের কোন বৈচিত্র্য বিশেষ নেই। উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ—কোথাও উঠেছে আর কোথাও বা নেমেছে। কিন্তু তার থেকেও মনোরম নির্জনতা, সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার আর ঝিল্লীর সুর-ছন্দ।

কাঞ্চন মিশুকে লোক। কথা-ছাড়া সে থাকতে পারে না। কথা বলার আর্টটাও তার ভালো। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ তার আছে ; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার লোক সে। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাব্য তার ভালো লাগতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে তন্ময়তার ভাব তার নেই। উচ্ছ্বাস আছে প্রচুর ; কিন্তু গভীরতা নেই। আর গভীরতা নেই বলে গাম্ভীর্যও সে সহ্য করতে পারে না।

রাগিনী তার বিপরীত ধর্মী। উচ্ছ্বাস আছে তারও কিন্তু সে-উচ্ছ্বাসের মাঝেও একটা সংযমের ভাব আছে। উচ্ছ্বাসের আবেগের বন্যায় ভেসে চলার ভাব তার নেই। আর প্রকৃতির রোমান্সে সে মাঝে মাঝে ডুবে যায়। লিরিকের মধ্যে তত্ত্ব এবং তথ্য খুঁজে দেখার প্রয়াসও আছে তার। এত যত্নের, এত উদ্যমের—এত সাহসের শৈল-পরিক্রমায় তাই সে নিছক খানিকটা রোমান্স কুড়োতেই ব্যস্ত নয়।

কিছু রহস্য - কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে জীবন-দর্শন তার ভরে উঠবে।

কাঞ্চনের আর কী? বড়লোকের ছেলে বড়লোক। হিমালয়ের এই নৈসর্গিক শোভা—এতো তার নিত্য-পাওয়া। এর জন্মে চাওয়ার কোন তাগিদ নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ নব-সঙ্গিনীকেই তার ভালো লাগছে।

রূপটা সব সময় দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দেহাতীতও রূপ আছে। সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রে মানসিকতায় পরিব্যপ্ত। এবং তা নিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকাও বুদ্ধির বিলাস। অন্ততঃ মুখ বদলানো বলা যেতে পারে। রুচির ক্ষেত্রে এই মুখ বদলানো যে কত বড় প্রয়োজন —মাত্র একটি বেলার সাহচর্যেই কাঞ্চন তা বুঝেছে রাগিনীকে পেয়ে।

শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং—এ-পথে তার কত না আনাগোনা। বৌদির বোন তপতীকে নিয়েও কম-পক্ষে সে বার দশেক আসা-যাওয়া করছে; কিন্তু রাগিনীর-আস্বাদ যত মধুর—ততখানি মাধুর্যকে সে উপভোগ করতে পারে নি। কথার-পিঠে এমন কথার বিন্যাস কোথায় তপতীর মধ্যে?

তপতীর দেহের উষ্ণতা—সে তো অনেক পাহাড়ী-কামিনকেও গাড়িতে পাশে নিয়ে চলতে সে অনুভব করেছে। কী উষ্ণতা—তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে কী প্রদাহ! কিন্তু কথা বলা চলে না তাদের সঙ্গে। ভাবের কোন বিনিময় ঘটে না তাদের সঙ্গে। শুধু দৈহিক অনুভূতি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলবেন, সেইখানে মানসিকতারও চরিতার্থতা আছে। দেহ আর মন—একেবারে আলাদা সংজ্ঞা নয়। অন্ততঃ প্রেমের ক্ষেত্রে তো নয়ই।

দেহ আর মন—এ দুটির পৃথক সত্ত্বাকে অনুভব করেছে কাঞ্চন;

বিশেষ করে রাগিনীর সাহচর্যে। প্রথমে দেহের আকার্ষণ নয়—মনের আকর্ষণ। তার সঙ্গে দেহ একেবারে বিচ্ছিন্ন নাও হতে পারে। মনের দিক থেকে অসম্ভব ভালো লেগেছে কাঞ্চনের রাগিনীকে। যেমন দেহের দিক থেকে ভালো লেগেছে তপতীকে।

তপতীকে নিয়ে চলতে চলতে এত কথা সে কখনও বলে নি। বলতে ভালোও লাগে নি।

রামবাহাদুরের হাত থেকে ষ্টিয়ারিং সে কেড়ে নিয়েছে। তপতীকে দেখিয়েছে তার গাড়ি চালাবার কলা-কৌশল।

বাঁকের মুখে তপতী শিউরে উঠেছে— ও মাগো!

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছে কাঞ্চন—ভুয়ো।

ভুয়ো নয়। ষ্টিয়ারিং তুমি ছাড়ো। রামবাহাদুর চালাক।

কেন?

কেন আবার কী? এক্ষুনি এ্যাক্সিডেণ্ট হত।

এত কাঁচা ড্রাইভার আমি নই।

না হয় পাকা-ড্রাইভার বলেই স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু বীরত্বে আর কাজ নেই।

কাঞ্চন কাব্য করার প্রয়াস করেছে তখন—

'Away, away from men and towns
To the wild wood and the downs'—

এ-কথার কোন অর্থই বোঝে নি তপতী। শুধু বোকার মতন মোটা সুরে সে বলেছে—অত কাব্য করার সখ আমার নেই বাপু। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

তবু কাঞ্চন বলেছে, তা হলে আর কী রোমান্স হল?

মরে গিয়ে রোমান্স? এমন রোমান্স চুলোয় যাক্!

এরপর আর কোন কথা চলে না।

রাগিনীর সঙ্গে কিন্তু অনেক কথা বলা চলে। কথা বলতে পারলেই যেন কাঞ্চন ধন্য হয়। কথার মধ্যে তার সুর আসে। এইটুকুখানি শহর পরিক্রমায় কত কথাই না সে বললে রাগিনীকে।

ডাক বাংলো পার হয়ে পাহাড়ী রাস্তা ক্রমশঃ উঁচুর দিকে প্রসারিত। হৈমন্তিক সন্ধ্যায় এরই মধ্যে সে-পথ নির্জন হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দু'চারজন পাহাড়ী অধিবাসীর সাক্ষাৎ মিলছে। পাহাড় এখানে অপেক্ষাকৃত মৌন—গম্ভীর। অন্তহীন পাহাড়ের গায় শুধু বাঁকের সমারোহ। এখানে-ওখানে ঝর্ণার কলতান।

সন্ধ্যার অন্ধকার ছাপিয়ে ফিকে জ্যোস্নার আলো। উপরের টিলায় পাইনের মাথায় চন্দ্রালোক। নীচে খদে রহস্যময় অন্ধকার।

কেমন লাগছে আপনার ?

কাঞ্চনের প্রশ্নের উত্তরে রাগিনী বললে, চমৎকার !

তা হলে অপকার করিনি বলুন !

অপকার করবেন কেন ?

দার্জিলিঙে যেতে না দিয়ে।

রাগিনী বললে, দার্জিলিঙ সম্পর্কে এমন কিছু মোহ নেই।

কাঞ্চন জিগ্যেস করলে, তা হলে যাচ্ছিলেন কেন ?

হিমালয় দেখবার জন্যে।

দার্জিলিঙে কিন্তু তিস্তাকে পেতেন না।

কাঞ্চনের কথায় রাগিনী হেসে বললে, তিস্তাকে না পেলেও অন্য কিছু পেতাম হয়ত।

কাঞ্চন রহস্য করে প্রকাশ করলে, অন্য কিছু পেলেও তা বলে কাঞ্চন লাভ হত না।

বলেন কী! কাঞ্চন কী এমনই দুর্লভ?

শুধু দুর্লভ নয়—সুদুর্লভ।

আপনার নিজের সম্পর্কে তো দেখছি খুব উঁচু ধারণা!

আমার সম্পর্কে নয়, আমি বলছি কাঞ্চন-লাভ সম্পর্কে।

কথাটার বাঁকা অর্থ ধরলে রাগিনী। উত্তরটাও তাই একটু জোরালো হয়ে উঠল—কামিনীরা যদিও কাঞ্চনপ্রিয়, তবু তার মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে।

ব্যতিক্রম থাকতে পারে; কিন্তু অতিক্রম! অতিক্রম করতে পেরেছেন কী?

পেরেছি বৈকি! পেরেছি বলেই তো এত সাহস। কিন্তু আর নয়। চলুন, এইবার ফেরা যাক্।

কাঞ্চন পরিহাসের সুরে বললে, এত সাহসের কথা বললেন এই এক্ষুনি; এরই মধ্যে আবার পিছিয়ে যাচ্ছেন?

পিছিয়ে যাব কেন?

তবে যে ফিরতে চাচ্ছেন? Night is too young now!

রাগিনীও যেন লড়াই করতে চায়—অপপ্রয়োগ করবেন না। No—Please not!

মানে?

এর মানে দুই আর দুইয়ে পাঁচ নয়। দুই আর দুইয়ে চারই।

বুঝলাম না।

প্রচণ্ড ঠাট্টা করলে রাগিনী, এই বুদ্ধি নিয়ে কাঞ্চনের ঔজ্জ্বল্যকে প্রকাশ করছিলেন সগর্বে?

কাঞ্চনের হার হল। জিগ্যেস করলে, অপপ্রয়োগ কোথায় হল বুঝিয়ে বলুন।

রাগিনী বললে, এত মধুর কাব্যের প্রয়োগ পাত্র-বিশেষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা কী উচিত নয় ?

পাত্র-বিশেষ ? না পাত্রী-বিশেষ ?

ত্রুটি স্বীকার করে নিলাম। পাত্রী-বিশেষই না হয় হল।

তাই বলুন !

কিন্তু তা হলে অপপ্রয়োগ-দুষ্ট হলাম কেমন করে ?

নরম গলায় রাগিনী বললে, এ-গুলো যাঁর পাওনা তাঁর সম্পর্কে প্রয়োগই বিধেয়।

কাঞ্চন সকৌতুকে প্রশ্ন করলে, তিনি আবার কে ?

আনত মুখে রাগিনী উত্তর দিলে, যিনি আপনার Better-half !

আর একটু পরিষ্কার করে বলুন না কেন !

কাঞ্চনের কথায় রাগিনী সোজা করেই বললে, নিতান্তই শুনবেন ? শুনুন তবে। তিনি হচ্ছেন তপতী দেবী।

উচ্চকিত-কণ্ঠে হো হো করে হেসে উঠল কাঞ্চন। প্রাণখোলা হাসিতে তার কৌতুকোদ্ভাসিত মুখখানিকে নির্মল দেখাচ্ছিল।— সেদিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাগিনী।

কী দেখছেন অমন করে ?

কাঞ্চনের কথায় রাগিনী লজ্জা পেয়ে গেল। নিজেকে ঢাকতে গিয়ে সে প্রশ্ন করলে কাঞ্চনকে, কলেজে প্রক্সি দেওয়ার অভ্যাস বুঝি খুব বেশি ছিল ?

মাথা নেড়ে কাঞ্চন বললে, না। কিন্তু এ-কথার অর্থ ঠিক বুঝলাম না।

এইজন্যেই তো বলে পুরুষের বুদ্ধি।

রাগিনীর কথায় কাঞ্চন হেসে বললে, পুরুষের বুদ্ধির হার স্বীকার

করে নিলাম না হয়। স্ত্রী-বুদ্ধিতেই ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বলুন।

রাগিনী বললে, তার আর দরকার নেই। বেশ খানিকটা হাঁটা হয়েছে, এইবার ক্লান্তি বোধ করছি। চলুন ফেরা যাক্!

এরই মধ্যে কেন? সবে তো সন্ধ্যে। এক্ষুনি বাড়ি ফিরে কী করবেন? তার চেয়ে আসুন কাছাকাছি এই পার্কটায় খানিকক্ষণ বসা যাক্!

ডাক বাংলোর ওপরের টিলা পার্ক।

জনবিরল পার্কে কিছুক্ষণ বসেছিল কাঞ্চন আর রাগিনী। মাত্র একটি দিনের বন্ধুত্বে তারা অনেকখানি পরস্পরের কাছাকাছি এসে গেছে। রাগিনীর জীবনের কথা শুনে কাঞ্চন শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়ল তার প্রতি।

আপনাদের মতন মেয়েদের সত্যি আমি শ্রদ্ধা করি।—অনুরাগাপ্লুত কণ্ঠে কাঞ্চন বললে।

হঠাৎ শ্রদ্ধা নিবেদন কেন?—স্মিতমুখে রাগিনী প্রশ্ন করলে।

এই কঠিন মাটির সঙ্গে যে সংগ্রাম আপনি করছেন তা গৌরবের বিষয়। একটা পুরুষের পক্ষে যা করণীয় আপনি তাই করছেন। শ্রদ্ধা করব না আপনাকে?

করুন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু রাত কত হল সে-খেয়াল কী আছে?

কেন, আপনার ভালো লাগছে না?

ভালো লাগবে না কেন?

তবে?

রাত অনেক হল না?

কী আর এমন রাত হয়েছে? মাত্র পৌনে নটা।

আপনার বৌদি হয়ত কী মনে করছেন।

কী আবার মনে করবেন?

এই উড়ে এসে জুড়ে বসা।

জুড়ে বসুন না কিছুদিন। সত্যি ভারি ভালো লাগছে আপনাকে!

কাঞ্চনের কথায় যেন রোমাঞ্চ জাগে রাগিনীর মনে। এমনি সুর কতদিন সে শোনেনি। কিন্তু এ-সুরের পরমায়ু কতক্ষণ? বড় লোকের ছেলের এ-হয়ত খানিকটা মনের বিলাস। এমনি বিলাস তাকে নিয়ে পুলকেশও করেছিল একদিন। কত উচ্ছ্বাস কত স্তুতিবাদ। কিন্তু বাস্তবে তার মূল্য কতটুকু? আজ কী একবারও পুলকেশ তার কথা আর ভাবে?

তবু তন্ময়তায় আবার ডুবে যায় রাগিনী। জীবন-সত্যে এই ক্ষণ মাধুর্যকে নাইবা বিশ্লেষণ করে দেখলে সে এখন। তার চেয়ে এই ক্ষণ-টুকুই কেন না ভরে উঠুক্ মাধুর্যে।

কী ভাবছেন আবার? রাগিনীর তন্ময় নীরবতাকে লক্ষ্য করে কাঞ্চন প্রশ্ন করলে।

পুলক সিঞ্চিত কণ্ঠে রাগিনী উত্তর দিলে—ভাবছি, ভাবছি জীবন মাধুর্যের কথা।

My soul

Smoothed it self out—a long-cramped scrll
Freshning and fluttering in the wind.
Past hopes already lay behind.
What need to strive with a lifeawry?

প্রশংসা-মুখর কণ্ঠে কাঞ্চন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে—বাঃ, কী

সুন্দর আবৃত্তি করেন আপনি!

তাই নাকি? সত্যি ভালোলাগল আপনার?

সত্যি ভালোলাগল।

রাগিনী কৌতুক করে জিগ্যেস করলে, তপতী দেবীর গানের চেয়েও ভালো?

ফিকে জ্যোৎস্নায় কাঞ্চন রাগিনীর মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখলে। বললে, হঠাৎ এ-কথা বললেন কেন?

সহজ সরল কণ্ঠে রাগিনী জবাব দিলে—এমনি, নিছক পরিহাস শুধু।

শুধু পরিহাস?

হ্যাঁ, শুধুই পরিহাস।

তবু আপনার এই পরিহাস-কৌতুকের জবাব দিচ্ছি, শুনুন। তপতী দেবীকে আমি পছন্দ করি।

কাঞ্চনের এ-কথায় হঠাৎ যেন চাবুক খেলে রাগিনী। ধরাগলায় বললে সে, Don't go so far—please not। সে প্রশ্ন আমি করিনি। আমাকে এত ছোট ভাবছেন কেন?

সহজ কণ্ঠে নিজের মনোভাবকে প্রকাশ করলে কাঞ্চন, আমি তা ভাবিনি। আপনাকে ছোট কেন, অনেক বড় আসন দিয়েছি আমি। আপনি আমার বন্ধু।

মনের ঔৎসুক্যকে ব্যক্ত করলে রাগিনী, আর তপতী দেবী?

তিনি অত্যন্ত matter of fact! তবে ভারি কাজের মেয়ে। খুব গোছালো আর বুদ্ধিমতী। সংসারের আদর্শ- ঘরণী বা গৃহিনী হবার যোগ্য!

কেন তাঁর শিল্পানুরাগের কথাও তো শুনেছি। চমৎকার

রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারেন। আর আরো ভালো সেতার বাজান। রেডিওতে নিয়মিত প্রোগ্রামও পেয়ে থাকেন।

রাগিনীর কথায় কাঞ্চন হেসে বললে, সেটা তাঁর পোশাকী ফ্যাসান। আসল শিল্পী-সত্তা নয়।

এটা হয়ত আপনার ইমপ্রেশন মাত্র! গভীর তলদেশের খবর কী আপনি পেয়েছেন?

হ্যাঁ, এটা পাকা-ডুবুরীর মণি-মাণিক্যের সন্ধান।

রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল রাগিনী—ইস্, সাড়ে নটা। চলুন। আর একমিনিটও দেরি করা চলবে না। বড্ড রাত হয়ে গেছে।

পার্কের বাইরে আসতে আসতে কাঞ্চন বললে, আনন্দের ক্ষণকে সময়ের এমন চুলচেরা হিসাব দিয়ে ক্ষুণ্ণ করতে নেই।

স্মিত মুখে রাগিনী জানালে—কিন্তু matter of factকেও ভুলতে নেই ক্ষণ আনন্দে অধীর হয়ে।

ছট্‌ফট করছিলেন কাঞ্চনের বৌদি।

রাত অনেক হয়ে গেছে এখনো কাঞ্চনের দেখা নেই; আর তার সঙ্গে রাগিনীরও। এমন কী ঘনিষ্ঠতা, যে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত নির্জনে ঘুরতে হয়? আর এতটাও ভালো লাগে না মীনাক্ষী দেবীর। তাঁদেরও বয়েসকাল ছিল। এবং এখনো বয়েসকাল যায়নি। যতই হোক—কাঞ্চন পর-পুরুষ। পর্দার বালাই তিনিও মানেন না। একেলে মেয়ে। মেয়ে-পুরুষের মেলা মেশাকে কদর্থ করবার মতন মনোবৃত্তি তাঁর নেই; কিন্তু তাই বলে এতটা!

বিয়ের আগে মীনাক্ষী দেবীও কত ছেলের সঙ্গে মেলামেশা

করেছেন। কলেজে না যেতে পারেন তিনি; তাই বলে ঘরের কোনে কুনো মেয়ে হয়ে ছিলেন না কোনদিনই।

আঠার বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছে তাঁর কাঞ্চনের দাদা অঞ্জন রায়ের সঙ্গে। তার আগে কত ছেলেই না আসত তাঁদের বাড়িতে। আলাপ-পরিচয়ও হত। সিনেমায়ও গিয়েছেন দু'একজনের সঙ্গে—ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতেও। তাই বলে রাগিনীর মতন হ্যাংলাটে স্বভাব কী ছিল তাঁর?

সুস্মিতার বন্ধু! আচ্ছা, এসেছ যখন তখন দিন দুই থাক; কিন্তু সভ্যতা, সংযম এবং ভব্যতা থাকবে না কেন? এসে পর্যন্তই মুখে যেন খৈ ফুটছে! যেন কত কালের কত নিকটতর আত্মীয়।

কাঞ্চনেরও বাড়াবাড়ি ভাবটা বড্ড বেশি। বড্ড বেশি মেয়ে-ঘেঁষা স্বভাব।

সরকার মশাইয়ের পাশের ঘরটিই মীনাক্ষী নির্বাচিত করেছিলেন রাগিনীর থাকবার জন্যে। কাঞ্চনই যত গোল বাধিয়ে বসলে! পশ্চিম কোণের ঘর তাঁর বোন তপতীর জন্যে। তপতী এসে ওই ঘরেই থাকতে ভালোবাসে। তপতীর ওপরও তাঁর রাগ হয়—এত অলস প্রকৃতির সে! ট্রেণের সময়টুকুর পর্যন্ত জ্ঞান থাকে না। সাজতে বসলে পুরো দু'ঘণ্টা সময় তার চাই। সাজতে বসেই নিশ্চয় সে ট্রেণ ফেল করেছে।

বৌদি, বড্ড দেরি করে ফেলেছি। কাঞ্চন এসে ত্রুটি স্বীকার করে নিলে।

আমার কিন্তু একটুও দোষ নেই বৌদি। বার বার আমি বলেছি বাড়ি ফিরবার জন্যে। আপনার দেওরের কালিম্পং দেখানোর ঔৎসুক্য আর থামে না।

ও, যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর। বেশ লোক যা-হোক আপনি। আমাকে কাঠগড়ায় ঠেলে দিয়ে দিব্যি নিজে সরে দাঁড়াচ্ছেন!—কৌতুক-কণ্ঠে কাঞ্চন অভিযোগ প্রকাশ করলে।

রাগিনী বললে, আমি কখন থেকে বলছি বাড়ি ফিরবার জন্যে—সেটা কী মিথ্যে কথা?

না, তা মিথ্যে কেন?

তবে, এত রাত্তির পর্যন্ত কালিম্পং দেখার ঘটা বাড়ি শুধ্যু লোককে ভাবিয়ে—বড্ড বাড়াবাড়ি নয় কী? মীনাক্ষীর মনের কথা রাগিনীই বলে ফেললে। বড্ড স্পষ্ট বক্তা মেয়ে সে।

বৌদির মুখের ভাবের কাঠিন্যকে ভদ্রতার খাতিরে তাই মুছে ফেলতে হল।

মীনাক্ষী দেবী বললেন—সে কী! বেড়াতেই তো আসা। তা নয়।

বৌদির কথা লুফে নিলে কাঞ্চন, কেমন হয়েছে তো?

মীনাক্ষী দেবী বললেন, আর কথাকাটি নয়। চল এবার খাবে চল।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই একটেলিগ্রাম এসে হাজির।

—এত রাত্রে তার? কোত্থেকে?

এক নিশ্বাসে টেলিগ্রাম পাঠ করে কাঞ্চন তা বৌদির হাতে দিয়ে বললে—দেখ, তোমার বোনের কাণ্ড!

কী হল আবার? উৎসুক কণ্ঠে বললেন মীনাক্ষী।

তুমি নিজেই পড়ে দেখ।

তার বার্তা পাঠ করে মীনাক্ষীর গম্ভীর মুখে প্রসন্নতা উঠল ফুটে। পরম নিশ্চিন্ততা একদিকে, আর একদিকে আনন্দোচ্ছাসের

বিদ্যুৎচ্ছটা তাঁর চোখে-মুখে প্রতিভাত হতে দেখা দিল। ভাদ্রের মেঘ গেল কেটে—মনের অসহ্য গুমোট আর নেই।

একেই বলে প্রাণের টান। কী মেয়ে বাবা!

বৌদির কথায় কাঞ্চন হেসে বললে, তোমারই তো বোন। কিন্তু বৃহস্পতিবারের বার বেলায় যে বার হচ্ছেন বড়? এইতো লিখেছিলেন—শুক্রবার যাত্রা করবেন।

হ্যাঁ। তাইত আগের টেলিগ্রামে জানিয়েছিল। তারপর মত পাল্‌টেছে আর কী! কী তুমিই অস্থির হয়ে টেলিগ্রাম করেছ কিনা তাই-বা কে জানে!—ঠাট্টার সুরে মীনাক্ষী মন্তব্য প্রকাশ করলেন।

আমি?—আকাশ থেকে যেন পড়ে কাঞ্চন।

বিশ্বাস কী?—বলেন মীনাক্ষী।

রাগিনী হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার উচ্ছল মনের প্রকৃতি-বন্যা পাহাড়ী-কন্যা তিস্তার মতনই এতক্ষণ তর তর করে বইছিল। দেরি করে বেড়িয়ে ফেরার জন্যে যে অসন্তোষ-মূর্তি মীনাক্ষী দেবীর—তাও তার কাছে ততটা অপ্রতিভের কারণ বলে মনে হয়নি। তাকেও সে মানিয়ে নিতে পেরেছিল; কিন্তু হঠাৎ এই তার-বার্তা তাকে যেন অতি মাত্রায় শক্ দিয়েছে। ইলেকট্রিকের প্লাগে হাতে লেগে তড়িতাহতের যে-মূর্চ্ছনা—সেই মূর্চ্ছনা তাকে এতক্ষণ যেন পেয়ে বসেছিল। মুখে-চোখে কীসের এক বিষাদের ছায়া! জ্ঞান ফিরে পাবার মতন চেতনায় সে সজাগ হয়ে উঠল। তার এই ভাব দেখে মীনাক্ষীই বা কি মনে করবেন? আর কাঞ্চন? কাঞ্চনই বা কী ভাববে তার সম্পর্কে?

জোর করে হাসি টেনে এনে রাগিনী কথার-পিঠে কথা জুড়ে দিলে—হ্যাঁ, বৌদি। আমি জানি। শিলিগুড়ি ষ্টেশনেই উনি তার

করেছিলেন ?

তাই নাকি ?

মিথ্যে কথা। কাঞ্চন বললে, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বৌদি।

মীনাক্ষী মিটি মিটি হাসছিলেন। মনের অন্ধকার তাঁর কেটে গেছে। কাঞ্চন-সম্পর্কে এখন নিশ্চিন্ত তিনি। আর রাগিনীকে তিনি দেখেও দেখছেন না।

রাগিনী আবার রসিকতা প্রকাশ করলে, শুধু শিলিগুড়ি ষ্টেশনেই নয়, এখান থেকেও আজ সন্ধ্যে বেলা কাঞ্চনবাবু আর একদফা টেলিগ্রাম করেছেন।

স্মিতমুখে বৌদি বললেন, বুঝেছি। ও, ডুবে ডুবে জল খাওয়া!

এইবারে কাঞ্চন হেসে ফেললে, আচ্ছা বুদ্ধি দুজনের!

রাগিনী বললে, কেন ?

আরে কাল সকালেই তো শিয়ালদহে তপতী আসাম লিঙ্কে চেপেছে। তাহলে টেলিগ্রাম করলাম কোথায় তাকে ?

কাঞ্চনের কথায় মীনাক্ষী মন্তব্য প্রকাশ করলেন, হাওয়ায় গো, হাওয়ায়। নাও চল, এবারে খেতে যাই।

আমি আর কিছু খাবো না বৌদি। আপনারা খান।—রাগিনী বললে।

বিস্মিত হলেন মীনাক্ষী, কেন ?

একরাশ খাওয়া হয়েছে।

তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালেন মীনাক্ষী—কোথায় ?

গুম্ফোয়। আপনার দেওর অনেক খাইয়েছেন।

রাগিনীর কথায় মীনাক্ষীর প্রসন্নমুখে আবার মেঘের উদয় হয়। সত্যিই কাঞ্চন যেন বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছে।

তুমিও কী খাবে না কাঞ্চন?—গম্ভীর মুখে মীনাক্ষী কাঞ্চনের দিকে তাকালেন।

কেন খাবো না? দুটো স্যাণ্ড উইচ, গোটা দুই কেক্ আর এক কাপ কফিতেই কী রাতের খাওয়া হয়ে গেল? এত ছোট পেট আমার নয়।—হেসে কাঞ্চন জবাব দিলে।

তা হলে তুমি খেয়ে নাও কাঞ্চন। কাল সকালে তো আবার ষ্টেশন এ্যাটেণ্ড করতে হবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়গে!

মীনাক্ষী কাঞ্চনকে নিয়ে চলে গেলেন। রাগিনী খানিকটা ইতঃস্তত করলে। একটা কঠিণ সমস্যায় পড়েছে যেন সে।

কিছুক্ষণ পরেই মীনাক্ষী ফিরে এলেন রাগিনীর কাছে।

রাগিনী তখনো নিজের ঘরে যায়নি। বারান্দার সোফায় গা এলিয়ে শুয়েছিল।

মীনাক্ষী বললেন, শুতে যাওনি এখনো?

না।

একটু যেন ইতঃস্তত করছিলেন মীনাক্ষী—কেমন করে কথাটি পাড়বেন!

রাগিনীর অনুমান সতর্ক। দৃষ্টি প্রখর। মীনাক্ষীর দৃষ্টি ধারাতেই সে তার সঙ্কল্প স্থির করে নিয়েছে। তাই বললে, একটা কথা বলবো বৌদি?

মীনাক্ষী তার কথায় তার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, আমিও একটা কথা বলবো ভাবছিলাম ভাই, যদি কিছু মনে না কর।

রাগিনী বললে, তার আর দরকার নেই বৌদি। তার চেয়ে আমার কথাটাই আগে বলে ফেলি।

বেশ বলো।

কাল সকালেই আমি যাবো।

কোথায় ?

কলকাতায়।

দার্জিলিঙ্ যাবে না ?

না।

এতদূর এলে, দার্জিলিঙ্‌টা দেখে গেলেই পারতে।—মীনাক্ষীর কথায় এবার সহজ-সারল্যের সুর।

রাগিনী বললে, এবার দার্জিলিঙ্ গেলে আর কখনো আপনাদের বাড়ি আসা হবে না।

কেন ?

এবার দার্জিলিঙ্ দেখা হয়ে গেল চোখে কী আর রঙ্ থাকবে বৌদি ? আর জানেন তো কেরানিগিরি করার অর্থ, তার ব্যয়-হিসাবে কতখানি সতর্ক হতে হয় আমাদের।

রাগিনীর কথায় সহজ হাসিতে দুলে উঠলেন মীনাক্ষী।—আচ্ছা, সেবার আমি যদি নিজে আমন্ত্রণ করি, আর পাথেয় দিই ?

তাহলে নিশ্চয়ই আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে চেষ্টা করবো। তবে আপনার দেওর হয়ত এতটা প্রসন্ন হবেন না তখন !—খোঁচা-টুকু আপনা হতেই কণ্ঠ থেকে বার হয়ে এল রাগিনীর।

কিন্তু মীনাক্ষী তাতে কর্ণপাত করলেন না। এত সহজে যে কাজ হাঁসিল হয়ে যাবে তা তিনি কল্পনাতেও আনতে পারেননি। তাই প্রসঙ্গের মোড় ফিরিয়ে বললেন তিনি, আচ্ছা ঘরে যাও। রাত্তির

হয়ে গেছে। শুয়ে পড়গে! কালকে যাওয়ার ভাবনা কাল সকালে করা যাবে।

মীনাক্ষী উঠে পড়েছিলেন।

রাগিনী ডাকলে, বৌদি!

মীনাক্ষী পিছন ফিরে দাঁড়ালেন—কী আবার?

একটা কথা!

বলো!

আমাকে যে-সম্মান, যে-স্নেহ দেখালেন তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আপনাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

ও, এই কথা! তুমি আমার ননদের বন্ধু। যেটুকু পেয়েছ, তা তোমার অধিকার-সূত্রেই পাওয়া। তার জন্যে তোমার এত লৌকিকতা প্রকাশ করবার দরকার নেই।

রাগিনী মীনাক্ষীর হাতদুটি চেপে ধরে বললে, না বৌদি, সত্যিই এ-আমার অন্তরের কথা।

মীনাক্ষী সস্নেহে বললেন, তোমার শিক্ষাকে সম্মান করবার সুযোগ দিলে ভাই, আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হও!

মীনাক্ষী চলে গেলেন। রাগিনীও নিশ্চিন্ত। মস্ত বড় অপমানের হাত থেকে আজ সে উদ্ধার পেয়েছে।

ছয়

সারারাত ঘুম হল না রাগিনীর।

শীতের আমেজটা যদিও বেশ লাগছে আর সুকোমল শয্যায় শুয়ে নরম তুলোর লেপটি যদিও খুব আরামদায়ক বলে মনে হচ্ছে ; তবুও চোখ দুটিতে ঘুম তার কিছুতেই আসে না।

বিনিদ্র রজনীর মাঝে রাগিনী ছট্‌ফট্ করতে থাকে। এ-পাশ ও-পাশ ফিরে কতবারই না সে ঘুমোবার চেষ্টা করলে ; কিন্তু নিষ্ফল আশা !

কাঞ্চনের সান্নিধ্য তাকে নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার আত্ম-সংযম, দৃঢ়তা আর বুঝি অটুট থাকে না। নিজেকে আর সে এখন শক্ত করে ধরে রাখতে পারছে না। বৌদির চোখে তাই সে ধরা পড়ে গেছে। মীনাক্ষী দেবীর ব্যবহারে তাই রুঢ়তার আভাষ।

মেয়েরা মেয়েদের সহ্য করতে পারে না। কাঞ্চনের তার প্রতি অনুরাগ এবং তার এই উড়ে এসে জুড়ে বসাকে মীনাক্ষী দেবী সহ্য করবেন কেমন করে ? তারওপর তাঁর স্বার্থ ও আছে। তপতী তাঁর বোন। আর তপতীর সঙ্গে কাঞ্চনের বিয়ে একরকম স্থিরই হয়ে গেছে।

রাগিনীর ছায়া এ-ক্ষেত্রে রাহু। রাহুর মতরই কাঞ্চনকে রাগিনী গ্রাস করেছে। মেয়ে হয়ে অন্ততঃ রাগিনী বোঝো—তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করা মীনাক্ষীর পক্ষে কত অসম্ভব। রাগিনী তো শুধুমাত্র দু'দিনের অতিথি আর নয়, কিংবা ননদ সুস্মিতার বন্ধুমাত্রও নয়। রাগিনী কাঞ্চনের অন্তরে এখন স্থানলাভ করেছে। মীনাক্ষী তাকে সহ্য করেন কেমন করে?

ঠিক এমনটিই ঘটেছিল বমপাশ টাউনের 'মধু-স্মৃতি'তে।

মাসিমার ননদেরও মুখ কালো হয়ে উঠেছিল পুলকেশের সঙ্গে রাগিনীর এমনি ঘনিষ্ঠতায়। দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত বেড়িয়ে ফেরা, সারাদিন একান্তে বসে ফিস্-ফিসানি—অসহ্য লেগেছিল পুলকেশের মা বিনোদিনী দেবীর।

কী এত কথা দু'জনের মধ্যে!—আর তাই আবিষ্কার করতে তিনি মেতে উঠলেন। রাগিনীর প্রতি তাঁর যে স্নেহ তা অন্তর্হিত হল। রীতিমত ঈর্ষ্যার ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন তিনি।

অবশেষে একদিন রাগিনীকে ডেকে নিজের নির্লজ্জ মনোভাবকে প্রকাশই করে ফেললেন—দেখ বাপু, তুমি এখন আর কচিখুকিটি নও। পুলকেশেরও বয়েস হয়েছে। তোমাদের দুজনের এত কাছাকাছি হওয়া, আর সর্বক্ষণ মেলামেশা ভালো নয়।

বিশুষ্ক মুখে রাগিনী বলেছিল, কেন মাসিমা? উনিতো আমার দাদা হন!

বিনোদিনী মাসি রাগিনীর এ-কথায় আরো চটেছিলেন, আজকালকার দাদা-দিদিকে পাঁচজনে ভালো চোখে দেখে না।

শোভনামাসি শুনেছিলেন এ-কথা। শুনে ননদের ওপর তিনি খড়গহস্ত হয়েছিলেন—মানে ?

পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে তো পারে দিদি ! বিনোদিনী দেবী নরম গলায় আপন মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

পাঁচজনের কথায় দরকার নেই, তোর নিজের কথা কী তাই বল ?

শোভনামাসির কথায় বিনোদিনী দেবী আরো একটু সুর নামিয়ে নিয়েছিলেন, আগুন আর ঘী। বয়েসটা তো ভালো না দিদি !

শোভনামাসি ফেটে পড়েছিলেন, তোর বাড়িতে কদিন আছি ; তাই বলে কী এমনি করে অপমান করবি আমাদের ?

বিনোদিনী দেবী বলেছিলেন, তুমি অমন ভাবে কথাটা গায়ে মেখে নিচ্ছ কেন দিদি ?

নেবো না ?—চীৎকার করে বলেছিলেন শোভনামাসি। অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এক্ষুনি গাড়ি ডাকতে বলে দে ! আমরা চলে যাবো। এই মুহূর্তে। তোদের এখানে আর জল গ্রহণ পর্যন্ত করতে চাইনে।

সে কী দিদি ! আমি কী তাই বলেছি ?

আর কী করে বলে শুনি ?

তুমি অন্যায় রাগ করছ দিদি ! তুমিই বলনা—দুজনে রাতদিনই ফিসফিসানি। কেউ কারুর কাছ ছাড়া হতে চায় না—এটা কী ভালো ?

ভালো নয় তোদের মতন অশিক্ষিত মেয়ের চোখে। ওরা লেখা-পড়া জানা ছেলে-মেয়ে। জ্ঞান-বুদ্ধি ওদের হয়েছে।

লেখা-পড়া জানা ছেলে-মেয়েরা কী ভিন্ন জাতের ? বয়েসের ধর্মও তো আছে।

রাগে বারুদ ফাটা হয়ে উঠেছিলেন শোভনামাসি।—তা সে উপদেশ তোর নিজের ছেলেকে দিলেই পারতিস!

সেইদিনই রাগিনীকে নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে চললেন।

যাবার সময় দীপ্ত কণ্ঠে তিনি বিনোদিনীমাসির কাছে গর্ব প্রকাশ করলেন, আমার মেয়েও ফেল্‌না নয়, জানিস্‌। লেখা-পড়া জানা মেয়ে। ওর দাম কী কম? আর ওর উপযুক্ত পাত্র-কেনার সঙ্গতিও ভগবান আমাকে দিয়েছেন।

বিনোদিনী দেবী আর কথা বাড়ালেন না। তিনি জানেন, কথায় কথা বাড়ে। আর শোভনাদির সঙ্গে কথায় টেক্কা দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। মন কেবল তাঁর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে, রাগ? না লক্ষ্মী! সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো!

ছল ছল করছিল পুলকেশের দুই চোখ। জীবনে তার প্রথম প্রেমের রোমাঞ্চ! এ-বিচ্ছেদকে তার অসহনীয় বলেই মনে হয়েছিল।

তবু রাগিনী জানিয়েছিল নিজের মনের কথা। অকপটে সে তার মনোভাবকে প্রকাশ করেছিল পুলকেশের কাছে—তোমার যদি সাহস থাকে, তবে চলে এসো আমাদের সঙ্গে। মাসিকে বলে আমিই সব ব্যবস্থা করে নেব।

পুলকেশ অশ্রু-ভাঙা কণ্ঠে আশ্বাস দিয়েছিল—হ্যাঁ, যাব। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আর শুধু কয়েকটি মাস অপেক্ষা করো। বাবার অফিসে চাকরিটা আগে বাগিয়ে নিই। তারপর তুমি-আর আমি আলাদা করে সংসার পাতবো।

আশ্বস্তই হয়েছিল রাগিনী।

বমপাশ টাউনে না হোক্, ওইলিয়ামস্ টাউনেই না হয় তারা থাকবে। কিংবা বেলা বাগান। একেবারে নন্দন-পাহাড়ের কোল-ঘেঁসে তারা গড়ে তুলবে নিজস্ব আবাস। 'মধু-স্মৃতি' না হোক্ তাদের জীবনের প্রেম-সাক্ষর বহন করবে তাদের ছোট্ট-নীড়টি। বাড়ির নাম দেবে 'কূজন।'

সতের বছরের কুমারী মেয়ের কলেজী-জীবনের সে-প্রত্যাশা তেইশ-বছরের কেরানি-জীবনে আজ আর নেই।

পুলকেশ 'মধু-স্মৃতির' মায়া কাটাতে পারেনি। বাপের অফিসে পাকা চাকরি পাওয়ার পরই তার বিয়ে হয়ে গেছে। অপূর্ব সুন্দরী নাকি তার স্ত্রী!

শোভনামাসি আশ্বাস দিয়েছিলেন রাগিনীকে—দুঃখ করিসনে, ওর চেয়ে ঢের ভালো বরে তোর বিয়ে দেব।

ফ্যাকাশে হাসি হেসেছিল রাগিনী।

মাসি বলেছিলেন, কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

রাগিনী তবু মুখ তুলে তাকাতে পারেনি।

শোভনামাসি সস্নেহে তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে পরম আদর-মাখানো কণ্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন, অনেক টাকা রেখে গেছেন তোর মেসমশাই। ভাবনা কী তোর? টাকায় কী না হয়রে! কুরূপ পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া যায় চাঁদির তোড়ায়!

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল রাগিনী।

আজ সে আর এক প্রত্যাশা লাভ করেছে কাঞ্চনের কাছ থেকে, জুড়েই বসুন না কেন! কিন্তু জুড়ে বসার অহঙ্কার তার কোথায়?

জীবনে-দর্শন তার দানা বেঁধেছে—তেইশ বছরের নারী-জীবনে অনেক অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করেছে সে। কঠিন রাজপথের যাত্রী। সে জানে, নিজের জীবনের মূল্যমান। সমাজে তার স্থান মেঘ-পাহাড়ের পরিবেশে নয়। রূপ আর রূপা—যা নিয়ে জীবনের আভিজাত্য, তা তার নেই।

পার্কসার্কাসের অন্ধ কক্ষেই তার যথার্থ স্থান।

একটি পুরো সংসার তার বিত্তকে যে সম্মান দেয়—সে সম্মান আর কোন জায়গা থেকেই সে পেতে পারে না। তার উপার্জনকে ঘিরে একটি বুভুক্ষু সংসারের বেঁচে থাকার চাহিদা। তার জীবনের সত্যকারের পাওনাকে সে পার্কসার্কাসেই পেতে পারে। বিয়ের কথায় বাবা তার কান দেন না এখন আর। শোভনামাসির মৃত্যুতে স্বার্থগত যে ক্ষতি হয়েছে তাঁর, তা কী মন থেকে সহজে মুছে ফেলা যায়!

শোভনামাসি থাকলে বিত্তবান জামাই হত তাঁর। আর ওই পার্কসার্কাসের বাড়িখানা—তাও তাঁরই করতলগত হত নিশ্চয়ই! পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে তিনি দিন কাটাতেন! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল!

তাই আর ভুল তিনি করতে চান না রাগিনীর বিয়ে দিয়ে। রাগিনীর পর ভামিনী, ভামিনী তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা। ভামিনী অন্তত: মানুষ হোক্ আগে। ছেলেদের প্রতি তাঁর কোন আস্থা নেই।

মা তবু মাঝে মাঝে রাগিনীর দিকে তাকান! নিজের নারী-চিত্ত দিয়ে তিনি রাগিনীকে বিচার করে দেখেন।

মেয়ের বয়েস হয়েছে—সংসারের স্বার্থে স্বামীর মতন এতখানি অন্ধ তিনি হতে পারেন না। স্বামীকে বলে বলে তিনি হার

মেনেছেন। এইবারে রাগিনীকে ধরেছেন—বিয়ে-থা করে এবার সংসারী হ!

মায়ের কথায় রাগিনী হেসে প্রশ্ন করেছে, পাত্র কই মা? কে তোমার এই কালো-কুলো মেয়েকে বিনা পয়সায় বিয়ে করবে?

হাসির ছলে কথাটি বললেও রাগিনীর কথায় গুরুত্ব আছে। কিন্তু রাগিনীর মা সে-কথা ভেবে দেখেছেন বৈকি! ভেবে দেখেছেন তিনি স্বামীর মতনই স্বার্থগত ভাবনায়—রাগিনীর উপার্জনেই তাঁদের এই সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হয়। বিয়ে হয়ে রাগিনী পরের ঘরে চলে গেলে পুরো সংসারে তাঁর দুর্ভিক্ষ ডাক্‌বে। তাই তিনি বহু বিচক্ষণতার সঙ্গে পাত্রও নির্বাচন করেছেন রাগিনীর। যে পাত্র শুধু জামাই হবে না। যে-পাত্রকে তিনি নিজের ঘরে নিজের সংসারের একজন করেই ধরে রাখতে পারবেন। সে–দিক থেকে শিশির ছেলেটি বেশ।

রাগিনীর কথার উত্তরে তিনি স্পষ্টকরেই জবাব দেন, কেন শিশির? শিশিরকে কী তুই পছন্দ করিস্‌নে রাগিনী?

মায়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে রাগিনী বলে, তোমার বিয়ে পাশ করা মেয়ের সঙ্গে ওই নন্‌ ম্যাট্রিক ছেলের বিয়ে দেবে তুমি?

কেন দেব না!—শিশিরের অবস্থা ভালো; আর চাকরি করে—তাও খারাপ চাকরি নয়।

না। চাকরি খারাপ নয়। তবে চাকরি গেলে, নতুন করে আর চাকরি পাবার যোগ্যতা তার নেই।

রাগিনীর মতন এতটা দূরদর্শিনী নন্‌ রাগিনীর মা। এতকথা তলিয়ে ভেবে দেখেননি তিনি কোনদিনই। তবু জবাব একটা তাঁর

আছে। বলেন, কেন? তুইতো আর অকর্মণ্য নস্!

না। তা নই। কিন্তু আমার একার রোজগারে দু'টো সংসারের ব্যয় ভার চালান অসম্ভব।

সে তো যদির কথা। অসম্ভবের ভাবনা অনেকটা।

অসম্ভবও যে সম্ভব হয় মা।—রাগিনী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে।

তখন আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। তার জন্যে তুই কেন সারা-জীবন বঞ্চিত থাক্‌বি?—মায়ের চোখদু'টি ছল ছল করে ওঠে।

রাগিনীও ভেবেছে শিশিরের কথা।

শিশির ইদানিং খুব আসা-যাওয়া করছে। মাঝে মাঝে উপঢৌকনও নিয়ে আসে। আর রাগিনীর প্রতি তার আকর্ষনও অনেক। আবেদন জানিয়েছে সে রাগিনীকে।

কিন্তু ভারি তরল ছেলে ওই শিশির। লেখা-পড়ার ধার ধারে না। আর্থিক অবস্থা ভালো। পার্কসার্কাসে পৈত্রিক বসত বাড়ি। আর ব্যাঙ্কেও নগদ কিছু টাকা আছে—যার সুদের হার একেবারে উপেক্ষনীয় নয়।

শিশিরের মামা কোন এক মার্চেন্ট অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারি। মামার দৌলতেই শিশিরের পাকা-চাকরি। মার্চেন্ট অফিসে আজ-কাল মাইনে পত্তরও ভালো। শিশির রাগিনীদের প্রতিবেশি।

দার্জিলিঙে আসার সময় শিশিরকে বলে এসেছে রাগিনী, সে তার প্রস্তাবকেই ভেবে দেখবার জন্যে দার্জিলিঙে চলেছে। নিরিবিলি সে একটু ভেবে দেখতে চায়।

গদ গদ কণ্ঠে শিশির প্রশ্ন করেছিল, আমি কী যাবো তোমার

সঙ্গে দার্জিলিঙে ?

না। আমি একটু একলা থাকতে চাই।—দৃঢ়কণ্ঠে রাগিনী নিষেধ জানিয়েছিল।

তবুও আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে শিশির নিজেকে মেলে ধরেছিল রাগিনীর সামনে—ভাবনাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল রাগিনী। আমি আর থাকতে পারছি না। তুমি ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার।

প্রথম প্রথম শিশিরকে উপেক্ষাই করতো রাগিনী।

শুধু লেখা-পড়ায় রাগিনী যে শিশিরকে ডিঙিয়ে গেছে তাই নয়—মনের গঠনও তার ভিন্নরূপ। তাই শিশির তার মনে কোন দাগ টানতে পারেনি।

তবু শিশিরের ধৈর্য আছে। অনেক উপেক্ষা এবং উদাসীন-তাকে শিশির গায়ে মাখেনি।

একদিনের কথা স্পষ্টই মনে আছে রাগিনীর। শিশির যেদিন প্রথম রাগিনীর কাছে নিজেকে মেলে ধরে,—সেদিনের কথা।

বৈশাখের আকাশে কালবৈশাখীর মেঘের দাপাদাপি। প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে অপরাহ্নের ধূসর আকাশে। কার্জন পার্কে ঝড়ো-হাওয়ায় ধূলোর ঝড়। অফিস থেকে বেরিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল রাগিনী। কোথায় একটু আশ্রয় নেয় ?

শিশির সেই সময় আকস্মিক সেখানে এসে উপস্থিত।

চৌরঙ্গীর দামী রেঁস্তোরায় স্যাণ্ড-উইচ্ আর চা জলযোগান্তে চলন্ত ট্যাক্সিতে দু'জনে পাশাপাশি বসেছিল।

শিশিরের কণ্ঠে অজস্র উচ্ছ্বাস। বাইরের ঝড় তখন থেমে প্রবল; বৃষ্টি নেমেছে প্রবল বর্ষণে। সেই বর্ষণের সুরই শিশিরের কণ্ঠে প্রতি-

ধ্বনিত। রাগিনী শুধু নীরব। তারপর অতি অকস্মাৎ শিশির যখন রাগিনীকে কাছে টানতে চেয়েছিল—রাগিনীর কণ্ঠে তখন শাসনের সুর।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিতে গেলে শিশির প্রবল আপত্তি জানায়।

রাগিনী বলে না। কিছুতেই নয়। তোমার কাছে কোন ঋণ আমি রাখতে চাইনে!

শিশির অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল।

রাগিনী তারপর তাকে এড়িয়ে চলেছে—উপেক্ষা করেছে। শিশির ততই তার অনুকম্পার ভিখারী হয়েছে।

শিশিরের মতন কাঞ্চন অবিশ্যি তার মনোভাবকে ব্যক্ত করেনি রাগিনীর কাছে। তবু রাগিনী জানে—শিশিরের ধরনের প্রেম-নিবেদনে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যই থাকে। একেবারে জোলো কথা। পুলকেশ যেমন বলেছিল—শিশিরও তাই বলেছে। তার চেয়ে কাঞ্চনের কথার দাম আছে।

যা সয় তাই ভালো। আর শিশিরকে তার একটুও ভালো লাগে না। বড্ড তরল মন তার। শিক্ষা দীক্ষার কোন সংস্কৃতিও নেই তার চরিত্রে। কিন্তু রাগিনীর প্রতি অনুরাগ আছে। সময়-অসময়ে উপকারও সে তাদের যথেষ্ট করে। মা তো শিশির বলতে অজ্ঞান। বাবাই কেবল দেখতে পারেন না তাকে। রাগিনী বিশ্লেষণ করে দেখেছে—সেটা তাঁর স্বার্থপরতা। বিয়ে করে মেয়ে যদি আজ আপন ঘর-সংসারে মন দেয়, তবে তাঁদের দেখবে কে?

নরম বিছানায় শুয়ে আপাদ মস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে রাগিনী এই কথাই ভাবছিল। পায়ের তলার শক্ত মাটিকে বার বার সে অনুভব

করে। তবুও পাহাড়ের মাথায় মাথায় রঙ্ ধরেছে। মেঘের বিন্যাস। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের মাথায় কত বিচিত্র বর্ণের সমারোহ! কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও বা সাতরঙা রামধনু। আর নীচে থেকে রাশি রাশি সাদা মেঘের ফেনা পাকিয়ে পাকিয়ে উধ্বর্-লোকে উঠেছে। কাঞ্চন বলেছে—ওটা ফগ।

কখন না জানি ঘুমিয়ে পড়েছিল রাগিনী। তবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে জেগেছিল। জেগে জেগে সে রাতের প্রহর গুণছিল। ওয়াল ক্লকটায় মিষ্টি গানের সুরে বাজছিল—বারোটা, একটা, দুটো। কাঞ্চনের বৌদির মুখ ভার হয়ে উঠেছে। উড়ে এসে জুড়েই বসেছে সে। মীনাক্ষী সেই ভাবই আজ প্রকাশ করেছেন।

মনে থেকে থেকে দ্বিধা জেগেছে রাগিনীর। অস্বস্তি অনুভব করেছে সে—মীনাক্ষী সহজ মনে তাকে গ্রহণ করতে পারছেন না আর। মাত্র একটি বেলাতেই তাঁর মনের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু কাঞ্চন থাকতে তার বাধা কী? সেই তাকে আহ্বান জানিয়েছে। কাঞ্চন আগেই তাই বলেছে—মেয়েরা মেয়েদের দেখতে পারেনা। তা না পারুন মীনাক্ষী তাকে দেখতে—রাগিনীর তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। মেঘ ক্ষনিকের। দু'দিনের অতিথি সে। দুদিন বাদেই তো সে চলে যাবে। তখন আর কারুরই মন ভার থাকবে না। আর কালই তো তপতী এসে পৌঁচাচ্ছে। তপতী তার নির্দিষ্ট স্থানই অধিকার করে নেবে। কাঞ্চন—তপতী আর মীনাক্ষী—কালিম্পং-এর এই মেঘ, পাহাড় আর রঙ্। তার স্থান সেই সমতল ভূমি। পার্ক সার্কাসের সেই অন্ধকার একতলার কারাগৃহ। শহরের রাজপথ, জনপ্রবাহ, আর

সংসারের একটানা অভাব-অনাটন দারিদ্র্য, আর অস্বাস্থ্য। ভাই-দু'টির একটিও মানুষ হল না। দু'টি বোনকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব, আবার আর একটি শিশুর আবির্ভাব ঘটছে তাদের সংসারে। এইতেই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না ; তারপর আবার—

নাঃ, ভাবনার আর অন্ত নেই রাগিনীর। গভরমেণ্টের দপ্তরের সিনিয়র গ্রেডের কেরানিগিরি তবু ভাগ্যক্রমে জুটেছিল তাই না রক্ষে !

দরজায় যেন করাঘাত শোনা গেল।

এরই মধ্যে রাগিনীর ঘুম এসেছিল। চিন্তার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে কখন না জানি ঘুমের অতল সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিল সে।

দরজায় মৃদু ধাক্কা দিয়ে কাজ হয় নি—নিচু গলার ডাকও শুনতে পায় নি রাগিনী।

কাঞ্চন বললে, থাক্ না হয় বৌদি। ঘুমোচ্ছেন, ঘুম ভাঙিয়ে আর কাজ নেই।

মীনাক্ষী বললেন, তাই কী হয়! আর একটু জোরে দরজা ধাক্কা দাও, আরো জোরে ডাকো।

এইবার কাঞ্চনের ডাক শুনলে রাগিনী। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে।

কী ঘুম আপনার! একেবারে কুম্ভকর্ণকেও হার মানিয়েছেন।

নাঃ, বিশ্রী ঘুম ঘুমিয়েছিল রাগিনী। ভারি লজ্জা পেয়ে গেল সে। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললে, ছি, ছি, ভারি অসুবিধেয় ফেলেছিলাম আপনাদের।

মীনাক্ষী দেবীই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—না, না, আর কথাকাটি

নয়। হাতমুখ ধুয়ে চটকোরে চায়ের টেবিলে এসো। আর বেশি দেরি করলে, তোমরাই ট্রেণ মিস্ করবে।

তবু পরিহাস করতে ছাড়লে না রাগিনী, বেশ তো! সেবারে আপনার বোন ট্রেণ মিস্ করায় এলাম আমি, এবারে তপতীদেবী নিয়ে আসবেন—

কথার পিঠে কথা জুড়ে কাঞ্চন বললে, নাকের বদলে নরুণ!

মীনাক্ষীদেবীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাবারই কথা। কিন্তু রাগিনী চলে গেল বাথরুমে। আর মুখহাত ধুয়ে বেশ-বিন্যাস সেরে আসতে একটুও তার দেরী হল না।

চা-জল যোগাস্তে কাঞ্চন আর রাগিনী গিয়ে উঠে বসলো মোটরে। রামবাহাদুর প্রস্তুত ছিল, সেলফ স্টার্ট দিয়ে গিয়ারিংটা টেনে দিতেই গাড়ী গর্জন করে উঠলো। কিন্তু কী আশ্চর্য, বিছানা-পত্তর আর স্যুটকেশ কিছুই নিলে না কেন রাগিনী!

মীনাক্ষীদেবী নিশ্চিন্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর যেন হুঁস হল। বললেন, তোমার জিনিস-পত্তর যে সব পড়ে রইল রাগিনী।

বিস্মিত চোখে কাঞ্চন চেয়েছিলে বৌদির দিকে—তার মানে?

মীনাক্ষীদেবী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন, রাগিনী বলেছিল আজ সে কলকাতায় ফিরে যাবে।

রাগিনীর চোখে কৌতুক।

কাঞ্চনই জবাব দিলে, তাই কী হয় বৌদি! দার্জিলিঙ্ না দেখে ওঁর কলকাতায় যাওয়া হতেই পারে না। তপতীকে নিয়ে আমরা তিনজনই দার্জিলিঙ্ যাবো।

গাড়ী ততক্ষণ স্টার্ট নিয়েছে। মীনাক্ষী বিমূঢ়া। হেমন্তের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির শেষ-প্রহরের অন্ধকার। রাগিনী কিন্তু বেশ সপ্রতিভ ভাবে কাঞ্চনের পাশ ঘেঁষে বসেছে।

সাত

শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে আবার সেই অরণ্যময় পার্বত্য-প্রকৃতি। শুধু কুয়াশার জাল। হেমন্তের শিশিরে বরফে আচ্ছাদিত চারিদিক।

হেডলাইট জেলে রামবাহাদুর মোটর ড্রাইভ করে চলেছিল। শীতটা তখন জাঁকিয়ে এসেছে রাগিনীর কাছে। শুধু ওভার কোটে আর বাগ মানছে না। তার ওপর একটা গরম চাদর জড়িয়ে দিলে কাঞ্চন রাগিনীর গায়ে।

এখন আর বিশেষ কথা নেই কারুর মুখে। রাগিনীর তো নয়ই। বরঞ্চ কাঞ্চন কথা বলছিল মাঝে মাঝে, কলকাতায় ফিরে যাওয়ার মতলব তা হলে ভেস্তে গেল?

রাগিনী নিরুত্তর।

যার জন্যে এতদূর আসা, তা না দেখেই চলে যাওয়ার মতলব হয়েছিল কেন?

রাগিনী তবু কোন উত্তর দিলে না।

কী হল আপনার?—কাঞ্চন অধীর ভাবে প্রশ্ন করলে।

কই কিছুই তো নয়।—শান্তকণ্ঠে রাগিনী জবাব দিলে এইবার।

আবার কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। উভয়েই উভয়ের সান্নিধ্য শুধু অনুভব করছে।

কিন্তু চুপ-চাপ বসে থাকার ছেলে নয় কাঞ্চন। তার প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য। পাহাড় কেটে নগর তৈরী করে সে। সর্বক্ষণই কাজের কথা। জীবনে আর এক অন্তরঙ্গতার কথা রাগিনীই তাকে শিখিয়েছে। তাই এই দুটি দিনে সে বড্ড বেশি মুখর হয়ে উঠেছে।

রাগিনী কিন্তু স্তব্ধ। হঠাৎ যেন প্রশান্তির ধ্যানমগ্না। তাকে চুপ-চাপ থাকতে দেখে কাঞ্চন ভাবে, অন্য কথা। কোথাও হয়ত অসৌজন্য প্রকাশ পেয়েছে। অতিথি তাই রুষ্ট।

কাঞ্চন ত্রুটি পূর্ণ কণ্ঠে অপরাধ স্বীকার করে নিলে, অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, এই শীতে ঘুম থেকে তুলে আর এই পথে এনে।

না, কষ্ট আর কী। সংক্ষেপে জবাব দিলে রাগিনী।

মুখে না বললেও মনে মনে গালাগাল দিচ্ছেন নিশ্চয়ই। ভোরের এই দিব্যি আরামের ঘুম ছেড়ে কে আর আসতে চায় বলুন? আমার না হয় গরজ! কিন্তু আপনার কী? আপনি কেন মিথ্যে মিথ্যে কষ্ট করবেন? না, এ আমার ভীষণ অন্যায়। জুলুম।

রাগিনী কথাগুলি ঠিক শুনতে পায় নি। চোখদুটি তার বুঁজে এসেছে। গাটা খানিকটা ঢলে পড়েছে কাঞ্চনের গায়ে। সত্যি ঘুম পেয়েছে রাগিনীর।

কাঞ্চন আরো পাশ ঘেঁষে সরে বসল। রাগিনীকে শুইয়ে দিলে। মাথাটা কাঞ্চনের কোলেই থাক না কেন!

রাগিনী জেগে উঠল। লজ্জা পেয়ে গেল সে। ছিঃ, ছিঃ, কী ঘুম-কাতরে সে!

ওকী উঠে বসলেন কেন?

কাঞ্চনের কথায় রাগিনী বললে, আর লজ্জা দেবেন না।

লজ্জা পাবার কী আছে ?

আপনাকে একটু বসবার জায়গা পর্যন্ত দিচ্ছি না। এমনি স্বার্থ-পর আমি!

না, না। সেকী! আমিই বরঞ্চ জুলুম করছি আপার ওপর। সত্যিই আপনার ঘুম পেয়েছে। ঘুমানো এখন দরকার।

কাঞ্চন রামবাহাদুরকে গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিলে।

রাগিনী বললে, গাড়ি থামালেন কেন ?

আমি যাচ্ছি ওদিকে ; রামবাহাদুরের পাশে। আপনি আরাম করে শুয়ে পড়ুন।

রাগিনী কাঞ্চনের হাত চেপে ধরে বাধা দিয়ে বললে, না।

কেন মিথ্যে মিথ্যে কষ্ট করবেন ? এখনো অনেক পথ। একটু ঘুমিয়ে নিন্!

না, আপনি বসুন।

কাঞ্চন কিছুতেই শুনলে না সে-কথা। সে উঠে গিয়ে রাম বাহাদুরের পাশে গিয়ে বসল।

সেবকের কাছে গিয়ে গাড়ি থামল। তখন একটু একটু ফরসা হতে সুরু হয়েছে। কুয়াশার আবরণ আর ততটা নেই। রোদ উঠবে। হেমন্তের প্রভাতের সোনালী রোদে উদয়ের পূর্বরাগ।

রাগিনী ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘণ্টা দেড়েক সে বেশ আরামের ঘুম ঘুমিয়েছে। কাঞ্চনের ডাকে সে উঠে বসল। চোখ মুছে তাকালে কাঞ্চনের মুখের দিকে।

দেখুন, আপনার অতি প্রিয় তিস্তা।

রাগিনী দেখলে। বিস্ময়-বিভূষিত নেত্রে আবার সে দেখলে, রূপালি তিস্তা। তর তর করে বয়ে চলেছে তিস্তা। কলস্রোতে কলতান। কান দিয়ে শুনতে হয়। সুন্দর দৃশ্য। চোখ যেন আর ফেরানো যায় না।

কাঞ্চন বললে, তিস্তাকে পাওয়া যায় কালিম্পঙে আর কাঞ্চন-জঙ্ঘাকে পাওয়া যায় দার্জিলিঙে। ঘুম থেকে দেখবেন সূর্যোদয়, কী অপূর্ব দৃশ্য সম্ভার!

রাগিনী বললে, কালিম্পঙেও তো দেখেছি কাঞ্চন জঙ্ঘা। তাই বা কম কী? তার ছবিও মনে আঁকা রইল। কী অপূর্ব বিস্ময়! কাঞ্চন যে এতো সুন্দর তা কল্পনাতেও আনা যায় না।

হ্যাঁ। অনুভবের বিস্ময় কণ্ঠের বিস্ময়কে হার মানায়। তবে আসল কাঞ্চনের বেলাতেই এ-কথা প্রযোজ্য।

নকল কাঞ্চন আবার কোথায়?

কেন, এইতো! আপনার পাশেই। নিজেকে দেখিয়ে কাঞ্চন বললে।

পরিহাস-কৌতুকে দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

কাঞ্চনের কণ্ঠের সুর এবার পরিবর্তিত হল, এই একদিন মাত্র আপনার সঙ্গে মিশে অনুভব করছি--

কী অনুভব করছেন?

রাগিনীর কথায় কাঞ্চন তবু দ্বিধা প্রকাশ করলে, বলব? ঠিক মনের ভাষাকে ব্যক্ত করব?

করুন না কেন।

ভরসা দিচ্ছেন?

স্মিত হাসি হেসে রাগিনী আশ্বাস দিলে, নির্ভাবনায় বলুন!

ভারি গলায় কাঞ্চন জানালে তার মনের ভাবকে, সত্যি যদি আসল কাঞ্চন হতে পারতাম আপনার কাছে !

রাগিনী নরম গলায় বললে, আসল নয় বা কেন কাঞ্চন বাবু। এমুহূর্তে আপনি এবং আমি হৃদয়ের অতি কাছাকাছি তো আছি। আমি যখন ভুলতে পেরেছি নিজেকে, নিজের দুর্ভাগ্য, সংসারের দারিদ্র্য—

কাঞ্চন রাগিনীকে বললে, আর আমি ? আমার পাথরে চাপা ঐশ্বর্য যে কী দুর্বিষহ বোঝা তা যদি বুঝতেন রাগিনীদেবী—

রাগিনী থামিয়ে দিলে কাঞ্চনকে। অস্ফুট কণ্ঠে সে শুধু বললে, Sing riding's a Joy I. For me. I ride.

আট

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস একটু লেটই ছিল।

তবু রামবাহাদুর খুব জোরেই ড্রাইভ করে এসেছে। মীনাক্ষী-দেবী আশঙ্কা করেছিলেন ট্রেণ পৌঁছাবার অনেক পরে গিয়ে কাঞ্চন ষ্টেশনে পৌঁছাবে। রাগিনীর ঘুম ভাঙাতেই যা দেরি হয়ে গেল! কিন্তু না, ঠিক সময়েই তারা পৌঁচেছে।

রামবাহাদুর গাড়ির দরজা খুলে দিলে। কাঞ্চন আর রাগিনী নেমে ষ্টেশন প্ল্যাট্‌ফরমে এসে দাঁড়াল। দুজনেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

আর কিছুক্ষণ বাদেই তপতী এসে পৌঁছাবে। তারপর তপতী আর কাঞ্চন—মেঘ আর পাহাড়। রাগিনী তখন কী করবে?

স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে কাঞ্চন। বললে, কী ভাবছেন?

কিছু না।

একেবারে নির্লিপ্ততা।

হ্যাঁ।

কালই কিন্তু আমরা দার্জিলিঙ্‌ যাব। দেখবেন কালিম্পঙ্‌ থেকে দার্জিলিঙ্‌ কী অপূর্ব দৃশ্য।

ও।

সত্যিই আশ্চর্য নির্লিপ্ততা রাগিনীর।

ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস এসে গেছে।

কাঞ্চন ব্যস্ত হয়ে উঠল। কোথায় তপতী ?

তন্ন করে খুঁজে দেখলে কাঞ্চন—না, তপতী আসে নি। অথচ এই ট্রেনে তার আসবার কথা। এবারে আর মিথ্যে বাঞ্চনা নয়। অস্পষ্টতাও কিছু নেই। তপতী আসে নি। কিন্তু তপতীর বার্তা নিয়ে এসেছে আর একজন।

নর্থ বেঙ্গলের সেকেণ্ড-ক্লাশ কপার্টমেণ্ট থেকে নেমে এল তপতী-দেরই এক আত্মীয়। স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করলে, তপতীর না আসার কারণ। তপতী আসতে পারে নি। কোনদিনই হয়ত সে আর আসতে পারবে না। আকস্মিক দুর্ঘটনা। ব্যবসায়ীর ফাটকা-বাজারে তপতীর বাবা সর্বস্বান্ত। ফার্ম লিকুইডেসনে যায় বাজারের দেনায়। বসত বাড়িটিও ক্রোক পড়েছে। পর্বত প্রমাণ দেনা। চাপা লোক তপতীর বাবা। কাউকে তা জানতে দেন নি। তপতীই উদ্ধার করছে বিপন্ন বাপকে। যেখানে বরপ্রথা পণ প্রবর্তিত, সেখানে কন্যাপণে তপতীর বাবা আবার উঠতে পারবেন—এই ভরসাতেই তপতী বিয়ে করতে রাজী বিবাদীকে। বয়েস একটু বেশি। প্রথম পক্ষের স্ত্রী অবর্তমান; কিন্তু টাকার কুমীর। তপতীকে ভারি পছন্দ তাঁর।

হিমালয় পাহাড়ের প্রকাণ্ড একটা ধ্বস্ কী ভেঙে পড়লে কাঞ্চনের মাথায় ? না জগদ্দল পাথরের বোঝা তার বুকে পিঠে ? নিঃশ্বাসও স্তব্ধ হয়ে আসছে। দু'খানি চিঠি আছে তপতীর। একখানি মীনাক্ষীদেবীর নামে। আর একখানি কাঞ্চনকে সম্বোধন করা।

সংক্ষিপ্ত ভাষায় লেখা।

'আমার জন্যে তোমাকে খাটো হতে দিতে পারি নে। তাই এই পন্থাই অবলম্বন করলাম। পিতৃঋণ পরিশোধের জন্যেই প্রথম দিন যেতে পারি নি। সেইদিনই কন্যা-আশীর্বাদ হয়ে গেল। ভেবে-ছিলাম আজ যাব, স্বকণ্ঠে মনের অভিপ্রায় তোমাকে জানাব। তাই টেলিগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু দুর্বলতা এমনই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে আর নিজে যেতে পারলাম না। আশা করি মার্জনা করবে।

ইতি

তপতী

স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিল কাঞ্চন। যে-মুক্তি সে চেয়েছিল এই কিছুক্ষণ আগেও রাগিনীর পাশে বসে, আকস্মিক কোন মন্ত্র শক্তির বলে সে-মুক্তি অসহ বলে বোধ হচ্ছে তার? মেঘ-পাহাড় আর রঙের রাজত্ব থেকে সেও এসে দাঁড়িয়েছে ধূলি-ধূসরিত রাজপথে। আকাশ যেন বিবর্ণ। যে শক্তি পাহাড় কেটে নগর গড়ে, সে শক্তি কোথায় এখন তার অবলুপ্ত?

তপতীকে আবার কেন গভীর ভাবে মনে পড়ে?

আগন্তুক বললেন, আমাকে আবার আসাম-লিঙ্কেই ফিরে যেতে হবে কাঞ্চন বাবু। কিছু যদি বলবার থাকে—

হ্যাঁ, বলবার আছে বৈকি! কাঞ্চনের এতক্ষণে খেয়াল হল কিছু বলবার আছে তার। না হয় রাগিনীকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্‌না কেন, কাল তপতী না আসায় যেমন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে নানা আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিল, ঠিক তেমনি সুরে আজও কেন না জিজ্ঞাসা করা যাক্, কী কথা বলবার আছে!

কিন্তু রাগিনী কোথায়? এ-পাশে, ও-পাশে, ষ্টেশন প্ল্যাট-

ফরমের এ-ধারে ও-ধারে কোথাও রাগিনীর সন্ধান নেই।

সে কি তেমনি ভাবেই শিলিগুড়ি ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ধূসর হিমালয়ের প্রতি আত্ম-নিমগ্ন হয়ে আছে ?

নাঃ, তাও নেই।

রামবাহাদুরের তাগিদে দুজনেই মোটরে গিয়ে উঠে বসল। তপতীর আত্মীয় আর কাঞ্চন।

কাঞ্চনের বিহ্বলতা দেখে একা তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আর আগন্তুকও অনুভব করলেন, মীনাক্ষী যখন তপতীদের নিকট-আত্মীয়া, তখন তাঁর সঙ্গেও একবার পরামর্শ করে পরের দিনই না হয় কলকাতায় ফেরা যাবে।

কাঞ্চন পুরুষ মানুষ। কর্ত্তব্য তাকে স্থির করে নিতে হল। জীবন তো আর শুধু রঙ্ নয়। রাগিনীর মতন মেয়েরাও যেখানে অবিচলিত ভাবে জীবন-সংগ্রামে রত সেখানে জড়-বিজ্ঞানবীদ্ কাঞ্চন কেন হেরে গিয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে ?

শিলিগুড়ি থেকে আবার কালিম্পঙে্র পথে মোটর ছুটে চলেছে।

ভোরের কুয়াশা কেটে গিয়ে সকালের রোদ ঝক্‌মক্ করছে। কাঞ্চন একটা সিগার ধরিয়ে গভীর চিন্তায় আত্ম-নিমগ্ন।

সমতলভূমি।—দুপাশে পাহাড় নেই, কিন্তু আরো কিছুদূর অগ্রসর হলে সেবক, তারপর পাহাড় আর অরণ্য শোভা, নীচে তিস্তার রূপালি রেখা।

আপনার নাম অবনীবাবু ?

কাঞ্চনের প্রশ্নের উত্তরে আগন্তুক বললেন, হ্যাঁ, অবনী সরকার।

আপনি ও-বাড়ির ?

দূর সম্পর্কে তপতীর কাকা। ওঁদের ফার্মেই চাকরি করি।

হঠাৎ এ-দুর্ঘটনার কারণ ?

ব্যাড ইন্ভেষ্টমেণ্ট। আর স্পেকুলেশনস্।

সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন তপতীর বাবা ?

হ্যাঁ। যথাসর্বস্ব খুইয়েও দেনা শোধ হয় না। তবে বিমল প্রকাশ বাবু সহায়ক হলে আবার উঠতে পারেন।

বিমল প্রকাশ বাবু কে ?

তপতীর ভাবী—

ও।

সেবক পার হয়ে রামবাহাদুর আবার মোটরে স্পীড বাড়িয়ে দিলে। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ। নীচে খদ, গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। কিন্তু কী আশ্চর্য হাত রামবাহাদুরের, তীর্থক গতিতে সে যান্ত্রিক-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়ে চলেছে।

কাঞ্চনের খেয়াল হল, এইবারে সে ড্রাইভ করবে। এই পাহাড়ী পথে হাতে স্টীয়ারিং নিয়ে সেও সমতলভূমি থেকে সামনের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করবে। কানে তার এখনো সেই কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা—Sing, riding's a joy ! For me, I ride.

লিঙ্ক এক্সপ্রেসের থার্ডক্লাশ কমপার্টমেণ্টে অসংখ্য যাত্রীর ভিড়।

কোলাহল—কলরব আর ব্যস্ততা। জীবনের সেই পুরাতন সুর।

কলকাতার রাজপথেও এমনি ভিড়। দশটা-পাঁচটার কেরানি

মহলের কর্ম্মময়-জীবনধারা। প্রয়োজনের তাগিদে শুধু ছুটে চলা।

এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে—একটির পর একটি স্টেশন পিছনে পড়ে থাকে। জীবনে এমনি অনেক ষ্টেশনই রাগিনী পার হয়ে এসেছে। তেইশ-বছরের নারী-জীবনে কত ষ্টেশন এল আর গেল।

পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরের সেই নদী-মেখলা গ্রাম, কলকাতার পার্কসার্কাসের শোভনা মাসির সুদৃশ্য অট্টালিকা, বমপাশ টাউনের 'মধু-স্মৃতি', আর কালিম্পং-এর মেঘ-পাহাড়ের রঙ্—এরপর? এরপর কী?

রাগিনী ভাবছে, কলকাতায় গেলেই আবার শিশির এসে ঘিরে ধরবে তাকে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক দীর্ঘশ্বাস আর আকুতি নিয়ে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে সে। ম্যাট্রিক ফেল হলেই বা; তবু তো চাকরিটা ভালো করে সে। তার চেয়েও বেশি মাইনে তার।

মায়ের ইচ্ছে শিশির কেন ঘর-জামাই হয়ে থাকুক না তাদের সংসারে! তাতে তো লাভই ষোল আনা!

কিন্তু রাগিনী ভাবে—কী বলবে সে শিশিরকে!

